❑ (Perspectives of Women's Education)

(Structure)

(Introduction) :

একটি বহুল প্রচলিত কথা আছে যে একজন পুরুষকে যখন শিক্ষাদান করা হয় তখন একজন ব্যক্তি শিক্ষিত হয় আর একজন নারীকে শিক্ষাদান করা হলে গোটা পরিবারটিকে শিক্ষিত করা হয়। অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক শিক্ষার মান, সুস্থ অবস্থান এবং অগ্রগতির জন্য নারী শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নানা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, যে দেশ যত উন্নত সেখানে নারী শিক্ষার ওপর জোর এবং সুযোগও তত বেশি। অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমেই নারীর সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ঘটানো যায় এবং সেটা আবার একটি সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

ভারতের ইতিহাস অনুসরণ করে আমরা দেখতে পাই যে নারী শিক্ষা নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে। কোনো কোনো সময় নারী শিক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে আবার কোনো কোনো সময় অত্যন্ত অবহেলিত হয়ে থেকেছে। তবে বেশির ভাগ সময়ই এটি সমাজের ওপরের শ্রেণির ভিতর আবদ্ধ ছিল। এই এককে আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে নারী শিক্ষা কী রকম ছিল সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

(Objectives) :

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষা কেমন ছিল জানতে পারবেন।
- বৌদ্ধ যুগে নারী শিক্ষা কেমন ছিল সে বিষয় জ্ঞান অর্জন করবেন।
- মধ্যযুগে নারী শিক্ষা কেমন ছিল জানতে পারবেন।
- নারী শিক্ষার বর্তমান অবস্থার পটভূমি অনুধাবন করতে পারবেন।

(Historical Perspective) :

ভারতের শিক্ষার ইতিহাসকে বিবর্তন অনুযায়ী আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ

(১) প্রাচীন যুগ বা বৈদিক যুগ

(২) বৌদ্ধ যুগ

(৩) মধ্যযুগ বা ইসলামিক যুগ

(৪) ব্রিটিশ বা প্রাক স্বাধীনতার যুগ এবং

(৬) স্বাধীনতার পরবর্তী অর্থাৎ উত্তর স্বাধীনতা যুগ।

(Women's Education in the Ancient or Vedic Age) :

বৈদিক যুগে মহিলারা যথেষ্ট স্বাধীনতা পেতেন। তাঁরা শিক্ষা অর্জন করতে পারতেন, যাগযজ্ঞেও অংশগ্রহণ করতে পারতেন। এমনকি তাঁরা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করার অধিকারীও ছিলেন। মুনি ঋষিদের কন্যারা আবাসিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমপরিমাণ বিদ্যা অর্জন করতে পারতেন। ২০০ খ্রি. পূর্বের আগে উপনয়ন মেয়েদের ক্ষেত্রেও বহুল প্রচলিত ছিল। এর নমুনা আমরা পাই বানভট্টের লেখা ‘‘কাদম্বরী”তে মহাশ্বেতা চরিত্রে। মেয়েদের শুধুমাত্র পৈতে পরার অধিকারই ছিল না, গুরুভাইদের সঙ্গে বেদ, বেদাঙ্গ পাঠ করার সুযোগও ছিল সমান। মাধবচার্যের লেখাতে ছেলেদের মতই ৮ বৎসরে মেয়েদের উপনয়নের উল্লেখ পাওয়া যায়। জ্ঞানী মহিলাদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হত, যেমন ‘‘ঋষিকা” (অর্থাৎ যিনি ঋষিদের মতই মন্ত্রস্রষ্টা হওয়ার অধিকারিণী) ‘‘ঋত্বিকা” (যিনি যজ্ঞের অধিকারিণী) ‘‘ব্রহ্মবাদিনী” (যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন), ‘‘মন্ত্রনীদ” বা ‘‘মন্ত্রদৃক” (যিনি মন্ত্র বা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করেছেন) ‘‘পন্ডিত” ইত্যাদি। রামায়ণ এবং মহাভারতে কুন্তি, কৌশল্যা, তারা, দ্রৌপদী ইত্যাদির নামের সঙ্গে ‘‘ঋত্বিকা” এবং ‘‘মন্ত্রনীদ” শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।

‘‘উত্তর রামচরিত” এ বাল্মীকির আশ্রমে রামের পুত্র লব-কুশের সঙ্গে আত্রেয়ীর বেদান্ত পাঠের উল্লেখ আছে।

‘‘বৃহদারণ্যক উপনিষদ”-এ জনক রাজ্যে, রাজা বিদেহর রাজসভায় গার্গী এবং যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে

তর্কবিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা উল্লেখ দেখা যায়। এবং সেখানে এটাও দেখা যায় যে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কে পরাজিত করেছেন।

উপনিষদে বেশ কিছু মহিলা শিক্ষিকার নাম পাওয়া যায়, যেমন—সুলভা, প্রথিতেয়ী, মৈত্রেয়ী, কার্যকাশিনী ইত্যাদি। পাণিনির লেখাতেও ‘‘ছাত্রীশালা’’ (ছাত্রীদের জন্য বাসস্থান) ‘‘আচার্যিনী’’ অর্থাৎ মহিলা শিক্ষিকার উল্লেখ দেখা যায়।

মহাকাব্যের যুগেও এই প্রথা চলতে থাকে। শুধু দর্শন বা তর্কশাস্ত্রেই নয়, মেয়েরা নানা রকম শিক্ষা অর্জন করতেন। যেমন মেয়েদের সামরিক বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও বাধা ছিল না। মহাভারতে অর্জুনের নির্বাসন কালে চিত্রাঙ্গদার নাম আমরা পাই একজন দক্ষ যোদ্ধা হিসেবে। সুভদ্রা ছিলেন একজন দক্ষ রথ চালক বা সারথি। মৃদগলিনী রথ পরিচালনা করতেন এবং সশস্ত্র হয়ে দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। বিসপালা যুদ্ধে তাঁর একটি পা হারান এবং অশ্বিনীর কৃপায় কৃত্রিম লৌহ পা ব্যবহারে সক্ষম হন।

পাণিনি বলেছেন যে সকল নারীগণ কঠ উপনিষদে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তাদের বলা হত ‘‘কঠী’’, কল্পতে যাঁরা দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাঁদের বলা হত ‘‘কল্পী’’। পাতঞ্জলী মহিলা শিক্ষিকাদের ‘‘ঔধমেধা’’ এবং শিক্ষার্থীনীদের ‘‘ঔধামেধী’’ বলে উল্লেখ করেছেন। মহিলারা তর্কসভায় বিচারকের আসনও গ্রহণ করতেন। যেমন শঙ্করাচার্যের সঙ্গে মদন মিশ্রের তর্কসভার বিচারক ছিলেন মদন মিশ্রের স্ত্রী উদয়ভারতী।

সামরিক শাস্ত্রে দক্ষ মহিলা বল্লভরাজকে বলা হত ‘‘শক্তিনী’’। কথিত আছে যে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সভায় মহিলা রক্ষীরা ছিলেন।

প্রাচীন ভারতে মহিলারা নানা কলায় জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেতেন। কিছু কলা ছিল যেগুলিতে তাঁরা বিশেষ দক্ষতা দেখাতেন যেমন—রন্ধন কলা, অঙ্কন, নৃত্য, সংগীত, সেলাই, সীবন শিল্প, বয়ন, তাঁদের কাজ ইত্যাদি।

অথর্ব বেদে বলা আছে যে ব্রহ্মচর্য সমাপন না করলে একজন কুমারী বিবাহযোগ্য হিসাবে গণ্য নয়। মেয়েদের বেদ ও বিজ্ঞান চর্চা করে নিজেদের চরিত্র গঠন করে তবেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত। তখন মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স ধরা হত ১৬-১৭ বৎসর। শুধু তাই নয়, মেয়েরা নিজেদের পছন্দমতো জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকারও পেত। বিবাহ পরবর্তী সময়েও মেয়েরা চাইলে তাদের লেখা-পড়া চালিয়ে যেতে পারত।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে থাকল এবং তার প্রভাব দেখা যেতে লাগল নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও। মনুর যুগ থেকে নারীর সামাজিক মর্যাদা কমে যেতে লাগল এবং নারী শিক্ষার অবনতি হতে লাগল। এই সময় সামাজিক শৃঙ্খলা ও বিধিনিষেধ কঠোর ভাবে প্রয়োগ হতে শুরু করে এবং সমাজ ক্রমশ আচার সর্বস্বতার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। মনুর বিধানে মেয়েদের বিবাহকে বৈদিক পাঠের সমতুল্য, স্বামী সেবাকে আশ্রমিক জীবনের সমান এবং গৃহকর্মকে সন্ধ্যা প্রার্থনার সমতুল্য হিসাবে গণ্য করার নির্দেশ দিয়ে মেয়েদের সামাজিক স্বাধীনতা ও শিক্ষা লাভের মূলে কুঠারঘাত করেছিলেন। তিনি ভারতীয় মেয়েদের পরাধীন অন্তঃপুরে নির্বাসিত জীবনযাত্রার পথিকৃৎ ছিলেন। মনু রচিত স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী কুমারী অবস্থায় কন্যারা থাকবে পিতার অধীনে, বধূ অবস্থায় স্বামীর অধীনে এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে। তাদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবন বলে আর কিছু থাকবে না।

মনু পরবর্তী সময়ে মেয়েদের বিবাহের বয়স মেনে আসে ১০-১২ বছরে। এতে তাদের ধর্মীয় মর্যাদা, সামাজিক মর্যাদা এবং শিক্ষালাভের সুযোগের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। উপনয়ন বা গুরুগৃহে বৈদিক রীতি অনুযায়ী বিদ্যারম্ভ থেকে মেয়েরা বঞ্চিত হতে থাকে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং যজ্ঞস্থানে তাদের অধিকার হ্রাস পেতে থাকে। মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হতে ক্রমশ পুরুষের আজ্ঞাধীন অন্তঃপুরে বন্দিনির জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে, গৃহকর্ম শিক্ষা, রন্ধন শিক্ষা, সংগীত ও অঙ্কন শিক্ষা তারা তাদের পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে অপ্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে অনুকরণ, মৌখিক নির্দেশ, শিক্ষানবিশ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জন করতে পারত। সেক্ষেত্রে নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার কোন সুযোগ বা ক্ষমতা থাকত না।

বর্ধিষ্ণু এবং রাজ পরিবারের মেয়েরা অবশ্য তখনো শিক্ষার সুযোগ পেতেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় পাঠ, কাব্য চর্চা, গৃহকর্ম শিক্ষা, রন্ধন শিক্ষা, সংগীত-কলা ও অঙ্কন শিক্ষা অর্জনের সুযোগ তখনও তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল।

(Women's Education in Buddhist Period) :

বৌদ্ধ যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাতে নারীদের অধিকার ছিল না। ত্যাগ এবং সন্ন্যাস ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার মূল নীতি। যার ফলে মেয়েরা ছেলেদের সমান সম্মান পেত না এবং পূর্ববর্তী যুগে নারী শিক্ষার যে অবনতি দেখা দিয়েছিল তা অব্যাহত ছিল। পরবর্তী সময়ে আনন্দ এবং মহাপ্রজাপতির অনুরোধে বুদ্ধ নারীদের শিক্ষা অর্জনের অনুমতি দেন। তাদের জন্য অবশ্য পৃথক বিহার, বিশেষ নিয়মকানুন এবং অনেক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা ছিল। মেয়েদের একক ভাবে শিক্ষকের নিকট থেকে পাঠ গ্রহণের অনুমতি ছিল না। তাদের ভিক্ষুণী হতে গেলে অনেক কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ভিতর দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হত। বৌদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের মধ্যে বৈশালীর আম্রপালী, বারাণসীর সুপ্রিয়া, উপালা প্রভৃতিদের নাম আমরা দেখতে পাই। সমসাময়িক কালে বেশ কিছু বিখ্যাত বৌদ্ধ নারী শিক্ষিকা ছিলেন যেমন মহাপ্রজাপতি, সুজাতা, সোমা, অনুপমা, ক্ষেমা, কিশা ইত্যাদি। তাঁদের রচিত সাহিত্যের নাম ছিল "থেরীগাথা"।

বৌদ্ধ যুগে সামাজিক শ্রেণি নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার কিছুটা প্রসার ঘটলেও নারীশিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল অঞ্চল বিশেষের মুষ্টিমেয় কিছু শ্রমণা, প্রব্রাজিকার মধ্যে। নারীশিক্ষা এই যুগেও ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেনি।

(Women's Education in Medieval or Islamic Age) :

ইসলাম ধর্মে মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণে কোন বাধা ছিল না, কিন্তু ওই সময় আমরা দেখতে পাই যে নারী শিক্ষা একটি প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে চলেছিল। পর্দাপ্রথার দরুন একটি বয়সের পর মেয়েদের বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষালাভের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন, পর্দা প্রথা এবং নানা ধরনের সামাজিক শৃঙ্খলের দরুন সাধারণ মেয়েদের পক্ষে শিক্ষার আলো পাওয়া সম্ভব ছিল না। অল্পবয়সে বিবাহ, সন্তান পালন ও অন্তঃপুরবাসী জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মেয়েদের সঙ্গে তাদের মৌলিক পার্থক্য বিশেষ কিছু ছিল না। তবে ধনী ও অভিজাত পরিবার এবং নবাব পরিবারগুলিতে মেয়েরা ইসলামিক ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করত। অনেক সময় হারেমগুলিতেও ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হত এই সব মেয়েদের জন্য।

বেশ কিছু শিক্ষিত নারীদের নাম আমরা সেই সময় দেখতে পাই যেমন ফতিমা, সোফিয়া, মারিয়াম, আয়েষা, জায়েনাব ইত্যাদি। সুলতানা রাজিয়া খুব শিক্ষিত ছিলেন। বাবরের মেয়ে গুলবদন বেগম ''হুমায়ুন নামা'' নামক জীবন চরিত লিখেছিলেন এবং তাঁর নিজের একটি গ্রন্থাগারও ছিল যাতে প্রচুর বইয়ের সম্ভার ছিল। বাবরের আর এক নাতনি গুলরুখ খুবই প্রতিভাবতী সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ''মুখ্‌ফি'' নামক ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। আকবরের নিজের মা হামিদাবানুও পন্ডিত মহিলা ছিলেন। আকবরের সৎ মা মোহম্‌ আনাগা শুধু যে বিদুষী ছিলেন তা নয়, তিনি একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনও করেছিলেন। জাহাঙ্গীর পত্নী নূরজাহান আরবি এবং ফারসি সাহিত্যে সুপন্ডিত ছিলেন এবং নিয়মিত সাহিত্য চর্চাও করতেন। শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ বেগম ফারসি ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন এবং কবিতা রচনা করতেন। শাহজাহানের বড়ো মেয়ে জাহানারা বেগম দুটি জীবনী লিখেছিলেন। নিজের সমাধির ওপর খোদিত স্মৃতিগাথাটিও তাঁর স্বরচিত। জাহানারার শিক্ষিকা ছিলেন এক বিদগ্ধ নারী সুফাউন্নিসা। তাঁর প্রভাবেই মমতাজ বেগম দরিদ্র মেয়েদের শিক্ষা ও উন্নয়নের জন্য নানা রকম অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের কন্যারা সকলেই বেশ শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা জিবুন্নেষা ফারসি এবং আরবিতে সুদক্ষ ছিলেন। তাছাড়াও তিনি লিপি কৌশল বিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর আরো দুই কন্যা বদরুন্নেসা এবং জিনাতুন্নেসা কোরান মুখস্থ করেছিলেন এবং স্মৃতি থেকে পাঠ করতে পারতেন।

সুলতান জালালুদ্দিন এবং আকবর মেয়েদের জন্য ''জেনানা'' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন তাঁর হারেমের মহিলাদের জন্য মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ করেছিলেন।

অভিজাত বংশের মেয়েদের মধ্যে ইসলামিক শিক্ষার কিছুটা প্রচলন থাকলেও এবং আকবর প্রমুখ উদার শাসকরা হিন্দুদের শিক্ষার কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতা করলেও মধ্যযুগে হিন্দু নারীদের শিক্ষার অবনতি অব্যাহত ছিল। কারণ রাজকীয় সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যদিও ধনী পরিবারগুলিতে তখনও মেয়েদের কিছু শিক্ষার প্রচলন দেখা যায়। মীরাবাঈ এবং চন্দ্রাবতীরা কবি ছিলেন। রানি দুর্গাবতীও সুপন্ডিত ছিলেন। এই সময় আমরা চাঁদবিবি নামে বিদুষী ও বীরাঙ্গনা মহিলারও উল্লেখ পাই।

সমসাময়িক সাহিত্য থেকে আমরা তখনকার নারী শিক্ষা সম্বন্ধে বেশ কিছুটা ধারণা পাই। ''ইচ্ছাবতী হরণ'', ''ধর্মমঙ্গাল কাব্য', ''ধর্মমঙ্গাল'', ''বিদ্যাসুন্দর'' কবি কঙ্কন রচিত চণ্ডীমঙ্গাল'' ইত্যাদি থেকে আমরা জানতে পারি যে মেয়েরা তখনও নৃত্য ও সঙ্গীতকলা চর্চা করত এবং নারী শিক্ষার একটি বহুল প্রচলিত গণমাধ্যম ছিল যাত্রা, কথকতা, নানা ধরনের মৌখিকভাবে প্রচারিত লোক সাহিত্য, গীতি কবিতা ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণভাবে মুসলিম সংস্কৃতি থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অজুহাতে মেয়েদের শিক্ষা নানা সংস্কার ও কুসংস্কারের নীচে প্রায় সম্পূর্ণভাবে চাপা পড়ে যায় এই সময়ে।

(Education of Women in the Modern Age) :

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইসলামিক শিক্ষা, দুর্বলতর প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি গ্রামীণ সমাজে কিছু কিছু আঞ্চলিক প্রয়োজন ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মোগল শাসনব্যবস্থা ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ার দরুন আঞ্চলিক শাসনকর্তারা অত্যাচারী ও শোষক হিসাবে ধীরে ধীরে স্বৈরাচারী হয়ে উঠলেন। শিক্ষার কোনও বিকাশ এই অবস্থায় হওয়া ছিল অসম্ভব। সেজন্য অনেক ঐতিহাসিকের মতে ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৬০০ খ্রিঃ থেকে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। কারণ সেই সময় ভারতে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র আগমন হয়। তার হাত ধরেই আসে খ্রিস্টান মিশনারিরা। এদের মুখ্য

উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনসাধারণের ধর্মান্তরিতকরণ এবং খ্রিস্টধর্মের প্রচার করার জন্য শিক্ষাকেই এরা প্রধান মাধ্যম রূপে বেছে নিয়েছিলেন। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও মিশনারীদের অবদান কম নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যাবসায়িক স্বার্থে ক্ষমতা দখল। ভারতে নিজেদের শাসন দৃঢ় করার কাজ সম্পন্ন হতেই এরা শাসনের প্রয়োজনেই শিক্ষিত সম্প্রদায় তৈরি করার দিকে নজর দিলেন। নারী শিক্ষার প্রসঙ্গ ছিল তাদের কাছে অবহেলিত। পরবর্তীকালে মিশনারিরা নানা জায়গায় শুধু মেয়েদের পড়ার জন্য বিদ্যালয় গড়েছিলেন। প্রথমদিকে এই উদ্যোগ একেবারেই ব্যক্তিগত ও বেসরকারি পর্যায়ে ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল সরকার এ ব্যাপারে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য দান করে নারী শিক্ষার প্রসারে উৎসাহ দান করতে এগিয়ে এসেছে।

এরপর আমরা আরো দেখতে পাই যে মিশনারিরা ছাড়াও বেশ কিছু ভারতীয় এবং বিদেশি বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি নারী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং নানা বেসরকারি প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশে নারী শিক্ষার বিস্তারের চেষ্টা করেন। নব জাগরণের সময় আমরা বেশ কিছু ভারতীয়কে এই প্রচেষ্টায় সামিলহতে দেখতে পাই। যেমন বাংলায়—রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও (Derozio), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব ইত্যাদি। গোঁড়ামির আবরণ ভাঙতে এগিয়ে আসেন আগরকর, রাণাডে, দাদাভাই নাওরোজি, জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ এবং অন্যরা।

১৯০১ খ্রিঃ মহিলাদের সাক্ষরতার হার ছিল মাত্রা ০.৭% যেখানে পুরুষদের হার ছিল ১০%। ১৯৩৭ খ্রিঃ সেই হার গিয়ে দাঁড়াল মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩%। নারী শিক্ষায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের জন্য একটি সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে এবং বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও আইন প্রণয়ন পরোক্ষভাবে মেয়েদের সামাজিক উন্নয়ন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে নারী শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করেছিল। ১৯৪৭ খ্রিঃ, স্বাধীনতার সময় নারী শিক্ষার হার গিয়ে দাঁড়াল ১৬% তে। এ সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী এককে আরো বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব।

(Present Status) :

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের ভারতের সংবিধানে পুরুষ ও নারীদের সম-অধিকারের কথা বলা রয়েছে। শুধু সাংবিধানিক স্বীকৃতিই নয় সরকার বিভিন্ন সময়ে নানা আইন প্রণয়ন এবং আদেশ জারির মাধ্যমে নারীদের সামাজিক মর্যাদা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ক্ষমতায়ন (empowerment) করতে নারীদের সমস্যার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করছে। এর ফলে যদিও শহরাঞ্চলে নারীর অবস্থানের এবং শিক্ষার সুযোগের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এখনও মেয়েদের অবস্থা যথেষ্টই করুণ। অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের এখনো প্রথাগত শিক্ষাদান করাকে বিলাসিতা ভাবা হয়। সংসারে ছেলে এবং মেয়ের প্রতি আচরণের বৈষম্যের কারণে মেয়েদের বোঝা ভাবা হয় এবং তাকে পরমুখাপেক্ষী, আর্থিক এবং শিক্ষাগত ভাবে পরনির্ভর করে রাখা হয়। তবে, শহরে এবং আর্থসামাজিকভাবে এগিয়ে থাকা পরিবারে এবং অঞ্চলগুলিতে পরিস্থিতি একটু আশার আলো দেখায়। যদিও সমগ্র দেশের পরিস্থিতি আশানুরূপ নয়। নারীভ্রূণ, কন্যাসন্তান হত্যা এখনও অবাধে ঘটতে

দেখা যায়। এর থেকেই বোঝা যায় যে নারী বহু পরিবারে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে অবাঞ্ছিত। তার মূল অন্যতম কারণ অবশ্যই অশিক্ষা। উপযুক্ত শিক্ষাই একমাত্র ফেরাতে পারবে নারীর মর্যাদা।

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী আমরা দেখি যে ভারতবর্ষে সাক্ষরতার হার ৬৫% এবং পশ্চিমবাংলায় সাক্ষরতার হার ৬৮.৮৪%। বর্তমানে সারা ভারতে নারী সাক্ষরতার হার ৫৪% এবং পশ্চিমবাংলায় সেটি ৫৯.৬১%। পুরুষ সাক্ষরতার হার সেই তুলনায় সারা ভারতে ৭৫% এবং পশ্চিমবাংলায় ৭৭.২%। অর্থাৎ এখানেও যথেষ্ট লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যাচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে। এই বৈষম্যই সমাজে মেয়েদের পিছিয়ে থাকার জোরালো প্রমাণ।

(Summary) :

ভারতের ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে নারী শিক্ষারও একটা আমূল বিবর্তন ঘটেছে। আমরা এটাও দেখতে পাই যে শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার একটা সম্পর্ক জড়িত আছে। বৈদিক যুগে যখন নারীর ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে সমান অধিকার ছিল, তখন তারা শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রেও পুরুষদের সঙ্গে সমান সুযোগ পেত। অপরদিক দিয়ে দেখতে গেলে, নারী শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে সম-অধিকার লাভ করেছিল।

ধর্মীয় সংকীর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে এল নারীর ওপর নানা সামাজিক বিধি নিষেধ। এর প্রথম কোপটা গিয়ে পড়ল নারী শিক্ষার ওপর। শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থেকে সে যত বেশি বঞ্চিত হতে থাকল, তত বেশি নিম্নগামী হতে থাকল তার সামাজিক মর্যাদা, ক্রমেই সে হতে লাগল শৃঙ্খলবদ্ধ। এই চিত্রটি অবশ্য কিছুটা অন্যরকম ছিল সমাজের উচ্চবিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী পরিবারগুলির ভিতর। সেখানে নারী শিক্ষা প্রচলিত ছিল কিন্তু কিছুটা পরিবর্তিত ভাবে। অর্থাৎ শাস্ত্র শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে নানা ধরনের কলা শিক্ষা, গৃহকর্ম শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া শুরু হল।

বৌদ্ধিক যুগ ও মধ্য বা ইসলামিক যুগে নারী শিক্ষা বেশ প্রতিকূল পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যায়। মুষ্টিমেয় কিছু মেয়ে বাদে সাধারণের জন্য শিক্ষা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পর্দাপ্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপতি হওয়ায় মেয়েদের সামাজিক মর্যাদারও অবক্ষয় ঘটে।

ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে এ দেশে নিয়ে আসে খ্রিস্ট্রিয় মিশনারিরা। তারা ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য নানা বিদ্যালয় খুলেছিলেন। শুধু মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় খুলেছিলেন তখনকার সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী। ক্রমে সরকারও আস্তে আস্তে নারী শিক্ষায় নিজেকে জড়াতে লাগল আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে।

ধীরে ধীরে নানা বেসরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সামাজিক চিন্তাধারার পরিবর্তন এবং ভারতীয় রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে নারী শিক্ষা গুরুত্ব পেতে লাগল। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নারী শিক্ষাকে আরো গুরুত্ব দেওয়া হতে লাগল। সংবিধানে শিক্ষাকে অধিকার বলে ঘোষণা করা হল। অনেক নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হল। গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষার প্রতি বেশি

নজর দেওয়া হতে লাগল। বেশির ভাগ রাজ্যেই মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক স্তর অবধি শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দেওয়া হয়।

(Exercise) :

•

১। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসকে আমরা কটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি?

২। কার রচনা এবং কোন্ গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রাচীন যুগে মেয়েদের উপনয়ন হত?

৩। মেয়েদের কত বছর বয়সে উপনয়ন হত?

৪। কার রচনা থেকে আমরা সেটা জানতে পারি?

৫। 'মন্ত্রনীদ" কাকে বলা হত?

৬। "ব্রহ্মবাদিনী" কাকে বলা হত?

৭। "উত্তর রামচরিত"-এ আমরা কোন্ মহিলার নামের উল্লেখ পাই যিনি লব-কুশের সঙ্গে বেদান্ত পাঠ করতেন?

৮। উপনিষদে উল্লিখিত দুজন মহিলা শিক্ষিকার নাম বলুন।

৯। বৌদ্ধ যুগের দুই মহিলা শিক্ষিকার নাম কী কী?

১০। "হুমায়ুন নামা" কার লেখা?

১১। "মুখ্‌ফি" ছদ্মনামটি কার ছিল?

১২। ১৯০১ খ্রিঃ নারী শিক্ষার হাত কত ছিল?

১৩। ১৯৪৭ খ্রিঃ নারী শিক্ষার হার কত ছিল?

•

১। বৈদিক যুগে নারীদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। মনুর যুগ থেকে নারী শিক্ষার অবস্থা কীরূপ হল সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। মনু পরবর্তী সময় মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

৪। বৌদ্ধ যুগে নারী শিক্ষার বিবরণ দিন।

৫। ইসলামিক যুগে নারী শিক্ষার অবস্থা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

•

১। প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করুন।

২। মধ্যযুগে নারী শিক্ষার বিবরণ দিন।

৩। আধুনিক যুগে নারী শিক্ষার রূপ বর্ণনা করুন।

❑

(Development of Women's Education during Pre-independence Period. Contribution of the Missionaries. Role of the British Government)

(Structure)

(Introduction) :

ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই প্রাক-স্বাধীনতা যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার অনুরূপ যার গোরাপত্তন করেছিলেন মিশনারিরা। পোর্তুগিজ, ডাচ ও ফরাসি মিশনারিরা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন মাতৃভাষায়, সর্বসাধারণের ভেতর শিক্ষা প্রসারের। এর পেছনে অবশ্য একটি গুপ্ত ও বৃহৎ উদ্দেশ্য ছিল। নিরক্ষর সাধারণ মানুষ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তাদের খ্রিস্টধর্মে রূপান্তরিত করা সহজ হবে এবং ধর্মান্তরিত হলে সাধারণ মানুষ ইউরোপীয় শাসনের প্রতি অনুগত থাকবে। অর্থাৎ প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভারতে শাসনের ভিত সুদৃঢ় করা। এরা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আলাদাভাবে সেরকম কোনও অবদান রাখেননি।

নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে বরঞ্চ আমরা অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা দেখতে পাই ইংরে মিশনারিদের। তাঁরা অনুভব করেছিলেন, মেয়েদের শিক্ষিত করে রাখলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনই সফল হবে না। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট এর আগে অবধি মিশনারি বা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করেছিলেন, কিন্তু ১৮১৩ পরবর্তী সময় তাদের কাজের ধরন অনেকটা পালটে যায়। তখন তারা সরকারের উৎসাহ পেতে থাকায় শিক্ষাকে আরো অন্যান্য দিকে সম্প্রসারিত করতে লাগলেন। নারী শিক্ষার প্রসার তাদের মধ্যে অন্যতম। পরবর্তী পর্যায় ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন সরকারি বার্তা (despatch) এবং আইন (Act) এর মাধ্যমে নারী

শিক্ষার জন্য অনুদানের অনুমোদন করতে লাগল। এ ছাড়াও নানা শিক্ষিত ও অভিজাত ভারতীয় শিক্ষানুরাগীরা সমাজ সেবক ও রাজনীতিবিদরা নারী শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হতে শুরু করলেন। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে থাকায়, প্রকৃত আধুনিক নারীশিক্ষার একটু একটু করে উন্নতি ঘটতে থাকল। নারী শিক্ষা এবং সামাজিক পরিবর্তন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই সময় নারী শিক্ষার প্রতি সরকারের আগ্রহ দেখা যায় তবে সবটাই স্বতঃস্ফূর্ত নয়। এর পিছনে চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে আলোকপ্রাপ্ত ভারতীয় সমাজের একাংশের আগ্রহ ও প্রভাব। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় উদ্যোগ, সরকারি প্রচেষ্টা ও আইন কানুন প্রণয়নের মধ্যে আমরা একই ভাবে সামাজিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পাই।

এই এককে আমরা প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে নারী শিক্ষা কীরকম ছিল, মিশনারিদের অবদান এবং ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।

(Objectives) :

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে নারী শিক্ষা কেমন ছিল জানতে পারবেন।
- নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারিদের অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- নারী শিক্ষায় ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

(Women Education in the Pre-Independence era) :

আমরা আগের এককে দেখেছি যে ভারতের ইতিহাসে, এক সময় নারী সমাজ যথেষ্ট সম্মানীয় জায়গায় ছিল। তখন তার জন্য শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সমাজ খুলে রেখেছিল। তৎকালে পুরুষের মত নারীও সব রকম শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতে পারত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিল। এর প্রভাব পড়ল গিয়ে নারী শিক্ষা ও নারীর সামাজিক অবস্থানে। মধ্যযুগে কিছু ব্যতিক্রম বাদে, সাধারণ নারীদের শিক্ষার সুযোগ প্রায় উঠে গিয়েছিল। টোল এবং চতুষ্পাঠীর দরজা তাদের জন্য বন্ধ ছিল।

মিশনারিরা আবার নতুন করে ভারতীয় নারীকে শিক্ষার আলো দেখাবার চেষ্টা শুরু করলেন। ১৮১৩ সালে চার্টার অ্যাক্ট-এর মধ্য দিয়ে সরকার (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) ও ধীরে ধীরে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা দায়িত্ব নিতে আরম্ভ করল।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই সময়ের নারী শিক্ষাকে দুটি দিক দিয়ে দেখব—মিশনারিদের ভূমিকা এবং ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকার দিক দিয়ে।

(Contribution of the Missionaries) :

মিশনারিদের শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল নারী শিক্ষা। শিক্ষার ইতিহাসে ১৭৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত "হেজেস্ গার্লস স্কুল" এর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবত সেটিই প্রথম মেয়েদের স্কুল। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়নি। মনে হয় স্কুলটি স্থায়ীও হয়নি। লন্ডন সোসাইটির রেভারেন্ড মে ১৮১৮ সালে চুঁচুড়াতে একটি মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে নারী শিক্ষার পথ দেখানো শুরু করেছিলেন। ১৮১৯ সালে উইলিয়াম কেরী শ্রীরামপুরে একটি মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮২০ সালে "ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি" ১৮টি স্কুল স্থাপন করে। পরবর্তী পর্যায় মিস কুক ১৮২১ সালে ৮টি এবং ১৮২২ সালে আরো ৪টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রমে লেখা, পড়া, অঙ্ক, ইতিহাস, ভুগোল এবং সেলাই শেখানো হত। ১৮২৪ সালে "লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন" স্থাপিত হয়।

১৮২৬ সালে মিস কুক (যিনি তখন বিবাহ সূত্রে মিসেস উইল্সন নামে পরিচিত হয়েছেন) রাজা বৈদ্যনাথের দেওয়া ২০,০০০ টাকা দিয়ে "সেন্ট্রাল স্কুল" স্থাপন করেন। সেখানে মহিলা শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণও আরম্ভ হয়।

সেই সময় ১৮২১ সালে, মাদ্রাজে প্রথম মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮০০ শতকের মাঝামাঝি সময় মেয়েদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় সাতে।

বম্বেতে প্রথম নারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮২৪ সালে। দশ বছরে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১০টি বিদ্যালয়ে। উত্তর ভারতের নানা জায়গায় নারী শিক্ষা কেন্দ্র গঠিত হতে লাগল। ১৮৩৫ সাল নাগাদ তখনকার অবিভক্ত বাংলাদেশে কয়েকটি জেলা ও বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে যেমন বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুরশিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, উত্তরপাড়া, বারাসাত, হাওড়া, খুলনা যশোর, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জায়গাও নারী শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নবজাগরণের যুগে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। পর্দা প্রথার বিলোপ হয়, মেয়েদের শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে অংশ নিতে আগ্রহ দেখা যায়। ভারতীয় শিক্ষাব্রতী রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতিরা এগিয়ে আসেন। রাধাকান্ত দেব কলকাতার শোভাবাজারে মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রাধানাথ শিকদার স্ত্রী শিক্ষার জন্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

কলকাতায় ১৮৪৯ সালে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন এবং দক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষাবিদ বাঙালির চেষ্টায় "হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়" (Calcutta Female School) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৭ খ্রিঃ এই স্কুল বেথুন কলেজে রূপান্তরিত হয়। স্কটিশ মিশনের রেভারেন্ড অ্যালেক্সান্ডার ডাফ বেশ কিছু মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন—যেমন "সেন্ট মার্গারেট স্কুল", "ডাফ স্কুল", "হোলি চাইল্ড স্কুল", "ক্রাইস্ট চার্চ স্কুল" ইত্যাদি।

বাংলার বাইরেও একই চিত্র দেখা যেতে লাগল। যেমন মহাত্মা ফুলে পুনেতে নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। এ ছাড়াও আহমেদাবাদ, বম্বে ইত্যাদি জায়গায় অনেক নারী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। মিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত বেশিরভাগ শিক্ষাকেন্দ্রই ধর্মীয় শিক্ষা দান করত। যদিও এইসব স্কুলে

মাতৃভাষাকে মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হত, এখানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাও দেওয়া হত। তবে যে সব বিদ্যালয়গুলি ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত যেমন বম্বেতে জগন্নাথ শঙ্কর শেঠের গঠিত বা মহাত্মা ফুলে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদান করা হত।

(Role of British Government and Non Government Agencies) :

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট (Chartar Act of 1813) ভারতীয় শিক্ষার একটা নতুন গতি ধারা এনে দেয়। তার আগে অবধি ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে সরকার কোনও রকম দায় নেয়নি। সবটাই বেসরকারি উদ্যোগ ছিল, বিশেষ করে মিশনারিদের দ্বারা। ১৮১৩র অ্যাক্টে বলা হল যে, কোম্পানি শিক্ষার দায়িত্ব নেবে না, তবে শিক্ষার প্রসারে উৎসাহ দিতে এক লক্ষ টাকা অনুদান প্রতি বছর দেবে। এর ফলে প্রচুর শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। এর মধ্যে বেশ কিছু মহিলা শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল। ১৮১৩ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষার চরিত্র নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে নারী শিক্ষার প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা হয়নি। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেকলের মিনিট (Macaulay's Minute, 1835) ও পরবর্তীকালে রাজা রামমোহন রায় ও উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (William Bentinck) ভারতীয় মেয়েদের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের যে সূচনা করেছিলেন, তাতে নারীশিক্ষা প্রসারের পথ সুগম হয়েছিল বলা যায়।

১৮৫০-এ, তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি বলেছিলেন যে একমাত্র নারী শিক্ষার মাধ্যমেই এ দেশের মানুষের মধ্যে কার্যকরী পরিবর্তন আনা যাবে। তাই তিনি সরকারকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেবার এবং উৎসাহ দেবার কথা বলেন। এরই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ১৮৫৪ সালের উড্ ডেস্প্যাচ-এ (Wood's Despetch, 1854)।

এই উড্ ডেস্প্যাচে প্রথম আর্থিক সাহায্য বা গ্রান্ট-ইন-এড্ (Grant-in-Aid) দিয়ে নারী শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগ নেবার কথা বলা হয়েছিল। তবে এর পরবর্তী সময় ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ হওয়ার দরুন সরকার সামাজিক ও ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এর ফলে সরকারি প্রচেষ্টায় ভাঁটা দেখা দিল।

১৮৭০-১৮৮২ সালের মধ্যে বেশ কিছু নারী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর বেশিরভাগ টাকাটাই এসেছিল প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য দেওয়া আর্থিক অনুদানগুলি থেকে।

ইংরেজ সমাজ সংস্কারক মিস মেরী কার্পেন্টার (Miss Marie Carpentar) চার বার ভারতে আসেন। তিনি মহিলা শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর সরকারি মহলের যোগাযোগগুলিকে কাজে লাগিয়ে ১৮৭০ সালে প্রথম মহিলা প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮২ সালের মধ্যে মেয়েদের জন্য ২,৬০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৫টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং একটি কলেজ বা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম দুই ভারতীয় মহিলা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি (degree) পেয়েছিলেন তাঁরা তৎকালীন বেথুন স্কুল (এখন যেটি মহাবিদ্যালয়) থেকে পাশ করেছিলেন। সেটি ছিল ১৮৮৩ সাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মহিয়সী মহিলা দুজন হচ্ছেন চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

১৮৮২-৮৩ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (হান্টার কমিশন) নারী শিক্ষা সম্বন্ধে বেশ কিছু সুপারিশ করে। যেমন, মেয়েদের বিদ্যালয় খোলার সমর্থনে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ দেওয়া, সরকারি অনুদান দেওয়া, অবৈতনিক শিক্ষা দান করা, নানা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষিকা তৈরি করা ইত্যাদি। কমিশনের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরকার যথেষ্ট পরিমাণের অর্থ ব্যয় করতে পারেনি নারী শিক্ষার পেছনে। ফলে নারী শিক্ষা সেই বেসরকারি উদ্যোগ নির্ভরশীল হয়েই ছিল।

১৯০১-০২ এর মধ্যে মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১২টি মহিলা মহাবিদ্যালয়, ৪২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫৩০৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৪৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তবে এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল বেসরকারি উদ্যোগ। যেমন ওপরে উদ্ধৃত সংখ্যাগুলির ভিতর সরকারি উদ্যোগ ছিল মোট ১টি মহিলা মহাবিদ্যালয়, ৬৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে।

এই সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল মহিলাদের জন্য ডাক্তারি পড়বার সুযোগ খুলে যাওয়া। ৭৬ জন মহিলা ছিলেন মেডিক্যাল কলেজে এবং ১৬৬ জন ছিলেন মেডিক্যাল স্কুলে। মহিলাদের ডাক্তারি শিক্ষার জন্য একটি তহবিল গঠিত হয় যেটির নাম ছিল ‘‘লেডি ডাফ্‌রিন ফান্ড’’।

১৯০২ এ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি কমিশনের সময় থেকে ১৯২১ এ যখন শিক্ষাকে ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তর করণের উদ্যোগ নেওয়া হল তখন পর্যন্ত নারী শিক্ষার বেশ দ্রুত অগ্রগতি দেখা যায়। এর মূল কারণ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং সামাজিক সচেতনতা যার একটি রূপ নবজাগরণের আবির্ভাব। তা ছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ক্রমশ দানা বাঁধছিল। জাতীয় চেতনার শিক্ষিত মেয়েদের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল।

লর্ড কার্জন (১৯০৪ খ্রিঃ) স্ত্রী শিক্ষার জন্য আরও বেশি সরকারি সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেন। তিনি মেয়েদের জন্য অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, অধিক সংখ্যক স্কুল পরিদর্শিকা (School Inspectress) নিয়োগ করেন এবং শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেন। ১৯২১-২২ সালের ভিতর মেয়েদের জন্য ১৯টি মহাবিদ্যালয়, ৬৭৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২১,৯৫৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যদিও সরকারি উদ্যোগের অনেক বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি প্রচেষ্টার দরুন স্থাপিত হয়েছিল।

১৯০৫-১৯২০ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দরা স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যার ফলে মেয়েদের শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পায়। ১৯০৪ সালে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের (Annie Besant) চেষ্টায় বারাণসীতে ‘‘সেন্ট্রাল হিন্দু গার্লস কলেজ’’ (Central Hindu Girls’ College) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৩ খ্রিঃ ব্যাঙ্গালোরে শ্রীমতী পার্বতী আম্মা চন্দ্রশেখর ‘‘মহিলা সেবা সমাজ’’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালে এই সমাজ একটি নারী শিক্ষা কেন্দ্র খোলে। এই সময়কার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হল মেয়েদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি। এর ফলে মেয়েদের শিক্ষা লাভের সুযোগের বৃদ্ধি ঘটে। বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের সুযোগ এবং শিক্ষা চালিয়ে গিয়ে সেটি সমাপন করার সুযোগও বৃদ্ধি পায়। পুরুষদের ভিতরও একটা সামাজিক এবং মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ বাড়ায় নারী শিক্ষারও প্রসার হতে দেখা যায়।

নারী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ১৯১৬ সালে। মহর্ষি ডি. কে. কার্ভে বম্বেতে এস. এন. ডি. টি. নারী বিশ্ববিদ্যালয় (S. N. D. T. Woman's University) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ খ্রিঃ মেয়েদের শিক্ষার জন্য "লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১-২২ সময় নাগাদ দেখা যায় যে ১৯৭ জন মহিলা ডাক্তারি কলেজে এবং ৩৩৪ জন ডাক্তারি বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করেছেন। ৬৭ জন শিক্ষক শিক্ষণ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন মহাবিদ্যালয়ে এবং ৩,৯০৩ জন নিয়েছেন বিদ্যালয়ে। বহু সংখ্যক মহিলা বাণিজ্যিক বিদ্যা (Commerce) এবং প্রযুক্তি (Technical Course) নিয়ে চর্চা করেছেন। ১৯১৭ সালে "উইমেন্‌স ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন" (Women's Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২১-১৯৪৭ এর মধ্যে নারী শিক্ষার আরও বেশি অগ্রগতি দেখা গেল। সামাজিক সচেতনতা ও উদারতা সামাজিক চিন্তার আরো পরিবর্তন আনতে শুরু করে। মেয়েদের বিবাহযোগ্যতার বয়স আরও বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং শিক্ষা সমাপন করার প্রবণতার বৃদ্ধি দেখা গেল। ১৯৪৭-এর মধ্যে ৫৯টি কলা এবং বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়, ২,৩৭০টি মাধ্যমিক এবং ২১,৪৭৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল মেয়েদের জন্য। ৪,২৮৮টি শিক্ষাকেন্দ্র মেয়েদের বৃত্তিমূলক, প্রশিক্ষণমূলক এবং বিশেষ শিক্ষা দান করত।

রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শিক্ষার ব্যাপারে বেশি উৎসাহ দানের ফলে বেসরকারি সংস্থাগুলির ওপর বোঝা কিছুটা কমেছিল। সরকারের পরিচালনাধীন নারী প্রতিষ্ঠান ছিল ১৬,৯৭৯টি, ২৮,১৯৬-র মধ্যে। এই সময় সহ শিক্ষা অর্থাৎ ছেলে-মেয়েরা একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৪৭ সাল নাগাদ দেখা যায় যে শিক্ষা অর্জন করেছে এমন মেয়েদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি মেয়েরা সেই সব সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করেন।

(Summary) :

এই এককে আমরা দেখতে পাই যে নারীদের সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থা কীরূপ ছিল। মিশনারিরা এসেছিল খ্রিস্টিয় ধর্ম প্রচার এবং প্রসারের জন্য। তাঁরা এটা বুঝেছিলেন যে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে এটা সম্ভব। তাই তাঁরা কিছু কিছু বিদ্যালয় খোলা আরম্ভ করেছিল। তারা এটাও বুঝেছিলেন যে সমাজের শুধু একটি অংশ অর্থাৎ পুরুষদের শিক্ষিত করে লাভ নেই। তাই তারা নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা আরম্ভ করেন। নারী শিক্ষার প্রসারে বেশ কিছু বিদেশিনীও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, যেমন মিস মেরী কুক্‌, যিনি পরবর্তী সময়ে মিসেস উইলসন্‌ নামে খ্যাত ছিলেন। ১৮২৪ সালে "লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন" (Ladies Society for Native Female Education) স্থাপিত হয়। জেলায় জেলায় এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানেই মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। এই সব বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সেলাই ও সূচের কাজ শেখানো হতে থাকে। এ ছাড়াও মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় নানা জায়গায়। মিশনারিরা ছাড়া বেশ কিছু ভারতীয়রাও এগিয়ে এসেছিলেন নারী শিক্ষার প্রসারের কাজে। অনেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন আবার অনেকে আর্থিক অনুদান দিয়ে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন।

১৮১৩ থেকে আমরা দেখতে পাই যে সরকারও নানা ভাবে ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেকে জড়াতে থাকে। আর্থিক অনুদান দিয়ে এবং বিদ্যালয় স্থাপন করে উৎসাহ দান করতে থাকে। তা সত্ত্বেও বেশিটাই

বেসরকারি উদ্যোগ রূপে এসেছিল। অধিকাংশ নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনার ভার বেসরকারি হাতেই ছিল। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গো চিন্তা ধারার পরিবর্তনও দেখা যেতে লাগল। বহু ভারতীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিও উৎসাহ দান করতে লাগলেন এবং নিজেদের নারী শিক্ষার সঙ্গো জড়াতে লাগলেন। এর ফলে অনেক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হতে দেখা গিয়েছিল। যদিও বেশিটাই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও চিন্তাধারার পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। যেমন ডাক্তারিতে মেয়েদের যোগদান, মহিলাদের জন্য মহাবিদ্যালয় স্থাপন এবং মেয়েদের পাঠগ্রহণ। মহিলা শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে মহাশিক্ষার প্রচলন। এগুলির সঙ্গো সঙ্গো সামাজিক পরিবর্তন যেমন, বিবাহ যোগ্যতার বয়স বৃদ্ধি ইত্যাদিও দেখা যেতে থাকে। যার ফলে নারী শিক্ষার প্রসার কিছুটা সুগম হয়।

(Exercise) :

●

১। কোন্ অ্যাক্টের দ্বারা এবং কোন্ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিক্ষার সঙ্গো জড়িত হল?

২। বম্বেতে প্রথম নারী বিদ্যালয় কোন্ সালে স্থাপিত হয়?

৩। রেভারেন্ড অ্যালেক্সান্ডার ডাফ কোন্ কোন্ বিদ্যালয় স্থাপন করেন?

৪। উড্ ডেস্প্যাচ কোন্ সালে হয়?

৫। কোন্ সালে ভারতে মহিলারা প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করেন?

৬। ভারতের কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম মহিলাদের পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেয়।

৭। মহিলাদের ডাক্তারি শিক্ষার জন্য তহবিলের নাম কী ছিল?

৮। ভারতীয়দের হাতে শিক্ষাকে কোন্ সালে দেওয়া হয়?

৯। ১৯১৬ সালে ডি. কে. কার্ভে মহিলা শিক্ষার কী গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন?

১০। লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

১১। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রথম স্নাতক দুই মহিলার নাম কী কী?

●

১। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে মিশনারিদের অবদান সম্বন্ধে লিখুন।

২। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কী ভূমিকা ছিল?

৩। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে সরকার নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল?

●

১। মিশনারিদের আগমন থেকে স্বাধীনতা পূর্ব অবস্থা অবধি ভারতে নারী শিক্ষার বিকাশ নিয়ে লিখুন।

❑

(Contribution of Indian thinkers, Rammohan Ray, Iswar Chandra Vidyasagar, Ramabai Saraswati and Rokeya Begum)

(Structure)

(Introduction) :

১৮১৩ সালের পর থেকে শিক্ষা প্রসারের একটা গতিবৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চিন্তাধারারও একটা পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। যখন দুটি সংস্কৃতি ও ভাবধারা পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন তাদের যে আদানপ্রদান ঘটে তার ফলে একটি অপরটির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এর থেকেই সৃষ্টি হয় নূতন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার; সহজ কথায় একেই বলে নবজাগরণ (Renaissance)।

তৎকালীন বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও দর্শনের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাই জন্ম নেয় বাংলার নবজাগরণের। এর ফলে বেশ দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার দ্বারা বিচার করা, ধর্মীয় ভাবধারার নব মূল্যায়ন ও পুনর্গঠন, বাংলা ভাষার পুনর্নির্মাণ, নতুন শিক্ষা ধারার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ইত্যাদি। অর্থাৎ পুরোনো মূল্যবোধের জায়গায় নতুন মূল্যবোধ জায়গা করে নিতে লাগল। সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও যে পরিবর্তন দেখা যেতে লাগল তার একটি দিক হল নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ এবং নারী শিক্ষার জন্য সচেতন ও সক্রিয় প্রচেষ্টা। মিশনারী এবং ইংরাজদের সঙ্গে বেশ কিছু ভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও এই

ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাংলার ক্ষেত্রে যেমন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও দুজন নারী, একজন আমাদের বাংলার রোকেয়া বেগম এবং অপরজন কর্ণাটক রাজ্যের রামাবাঈ সরস্বতী প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। এই এককে আমরা এঁদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করব।

(Objectives) :

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে—

- রাজা রামমোহন রায়ের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষায় ভূমিকা।
- রামাবাঈ সরস্বতী এবং নারী শিক্ষায় তাঁর অবদান।
- রোকেয়া বেগম ও নারী শিক্ষার প্রসার।

(Raja Rammohan Roy, 1772-1833) :

রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয় ২২ মে, ১৭৭২, হুগলি জেলার রাধানগরে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পণ্ডিত পুরোহিত। তবে তাঁর পূর্বপুরুষদের অনেকেই চলে গিয়েছিলেন প্রশাসনিক ও রাজস্ব বিভাগের চাকরিতে। রামমোহনের শিক্ষালাভ আরম্ভ হয় বাড়িতেই, শুভঙ্করী পদ্ধতিতে গণিতের পাঠদানের মাধ্যমে। পরবর্তী সময় তিনি পাঠশালা, চতুষ্পাঠী এবং আরবি ও ফারসি শিখতে মক্তব-এ যান। তিনি সংস্কৃত, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আরবি, ফারসি, ইংরেজি, কোরান এবং সুফি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন।

১৬ বছর বয়সে তিনি হিন্দুদের মূর্তি পুজোর বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখেন। সে জন্য কট্টরপন্থী হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা সমাজচ্যুত হন। তিনি ভারতবর্ষের নানা জায়গা এবং তিব্বতেও যান। চার বছর পর আবার ফিরে আসেন এবং ১৮১৪ সাল থেকে কলকাতাতেই থাকতে আরম্ভ করেন।

তাঁর জীবনের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা এবং অগাধ পাণ্ডিত্য তাকে যুক্তিবাদী ও উদার চিত্তের অধিকারী করে ছিল। তিনি নারী শিক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক কাজ করেন। ১৮১৮ সালে তিনি সতীদাহর বিরুদ্ধে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন। একবার লিখেই তিনি থেমে থাকেনি। ১৮১৯ এবং ১৮২৯ এ আবার সতীদাহর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেন এবং লেখেন। তাঁর বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুরা একজোট হয়ে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করা এবং তাঁর নিজের প্রাণ সংশয় হওয়া সত্ত্বেও ১৮২৯ এর ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন জারি করা হয়।

১৮২৮ সালে রাজা রামমোহন তাঁর "ব্রাহ্ম সমাজ" স্থাপন করেন। এটির উৎপত্তি হয় হিন্দুধর্মের

সংস্কার হিসেবে। রামমোহনের বৈদিক শিক্ষার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। উনি হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার এবং কু-রীতিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি হিন্দুদের নানা ধর্মগ্রন্থ থেকে দেখিয়েছিলেন যে আসল ধর্ম এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী। মূর্তিপূজা, জাত বৈষম্য, সতীদাহ, বহু বিবাহ ইত্যাদি প্রথাগুলি কোন ধর্ম নির্ধারিত রীতি নয়। তিনি খ্রিস্টান মিশনারিদেরও সমালোচনা করেছিলেন তাদের অতি উৎসাহ এবং ধর্ম প্রচার পদ্ধতি দেখে।

ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজা রামমোহনের অবদান অসীম। তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষকে আধুনিক করার জন্য ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তা ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য তৈরি বা সরকারি কর্মী বাড়ানোর জন্য নয়। রামমোহন চেয়েছিলেন ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের দরজা খুলে দিতে। তিনি বুঝেছিলেন বিজ্ঞানই মানুষকে উদারচেতনা করতে পারে, যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শেখায় এবং আত্ম-সচেতন ও আত্মসমালোচনা করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। এর মাধ্যমেই আসতে পারে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ।

তিনি বাংলা ভাষাকেও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন নানা ভাবে। যেমন, বাংলা শব্দকোশ তৈরি করে, তাঁর রচনাগুলির মাধ্যমে বাংলাভাষায় নিজস্ব গদ্যরীতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষাকে বিদ্যাচর্চার বাহন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার রামমোহনের পূর্বে শিক্ষিত মানুষের বিদ্যাচর্চার ভাষা ছিল সংস্কৃত অথবা ফারসি।

নারীর সামাজিক মর্যাদা উন্নত করার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার ছিলেন, তেমনি বিধবা বিবাহের সপক্ষেও খুবই জোরালো লড়াই করেছিলেন। তিনি মেয়েরা যাতে তাদের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে সে জন্যেও প্রচুর চেষ্টা করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত, যজ্ঞবল্লভ কাত্যায়ন, বৃহস্পতি ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলেন যে প্রাচীনকালেও মহিলাদের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার ছিল। পুরুষদের বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার ছিলেন। তিনি এক্ষেত্রে নানা ধর্মগ্রন্থ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলেন যে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই দেওয়া আছে। এটিকে বহির্ভূত ভাবে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে।

ব্রাহ্ম সমাজের জন্য যেসব নীতি, আচরণ বিধি ও নিয়ম তৈরি হয়েছিল তার মাধ্যমেও রামমোহন নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতির ওপর বিশাল প্রভাব ফেলেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল যে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন বা পৃষ্ঠপোষকতা করা, অর্থদান করা ইত্যাদি কাজের কোনটাই তিনি করেননি। কিন্তু পরবর্তীকালের জন্য নারীশিক্ষার ভিত্তিভূমিটি তিনি তৈরি করতে সচেষ্ট ছিলেন। বহু ভাষাবিদ, শাস্ত্রজ্ঞ, যুক্তিবাদী, বাগ্মী, সুলেখক ও সমাজ সংস্কারক রামমোহন বুঝেছিলেন যে নারীর শিক্ষার জন্য দরকার তাকে সামাজিক দুরাচার ও শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে মানবতার এই মুক্তি অনেকটা সুনিশ্চিত করতে পেরেছিলেন।

(Ishwar Chandra Vidyasagar, 1820-1891) :

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ সালে। তাঁর শিক্ষা শুরু হয় তৎকালীন হুগলি

জেলার (অধুনা মেদিনীপুর জেলার) বীরসিংহ গ্রামের পাঠশালা এবং টোলে। ১৮২৯ সাল থেকে তিনি সংস্কৃত কলেজে বিদ্যালাভ আরম্ভ করেন। ১৮৩৮ সালে তাঁকে ''বিদ্যাসাগর'' উপাধি দেওয়া হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে ভারতীয় শিক্ষার ঋণ অপরিসীম। তাঁর অবদান সর্বস্তরে এবং সর্বক্ষেত্রে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজি, সংস্কৃত এবং বাংলা শিক্ষার উপর সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যকে একসঙ্গে বজায় রাখা যায়। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চাও করা যায়। তাঁর লেখা বর্ণ পরিচয় (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) আজকের দিনেও বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক বই হিসেবে সমাদৃত।

তিনি রামমোহনের মতো বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাই নারীকে সমাজে স্বীকৃতি এনে দেবে এবং শিক্ষার ফলেই তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তিনিও রামমোহনের মতো সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে সোচ্চার ছিলেন এবং তাঁর অনলস চেষ্টাতেই শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়।

১৮৫৫ সালে তিনি বিধবা বিবাহের সপক্ষে তিনটি রচনা প্রকাশ করেন। সেই বছরই তিনি ভারত সরকারের কাছে গণ-বিবৃতি দেন। বিধবা বিবাহের প্রতি তাঁর এই সমর্থন শুধুমাত্র যুক্তিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি প্রয়োগ করে দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বড়ো ছেলে শম্ভুচন্দ্রের বিবাহ দেন একজন বিধবা নারীর সঙ্গে। শুধু তাই নয়, বিধবা নারীদের বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

১৮৫০ সালে, তিনি বেথুন স্কুল, যেটি মেয়েদের স্কুল, তার সম্পাদক (Secretary) হন। প্রথমে এই বিদ্যালয়টির নাম ছিল ''কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়''। পরবর্তীকালে এর নাম বেথুল স্কুল হয়। এই বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক ছিল। এ ছাড়া পুস্তক পাঠ, হাতের লেখা, বাংলার ইতিহাস, অঙ্ক, পদার্থ বিজ্ঞান, ভুগোল এবং সূচীকর্ম শিক্ষা দেওয়া হত। ইংরেজি শিখতে চাইলে তারও ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা, বিনামূল্যে পুস্তক প্রদান এবং যাতায়াতের জন্য গাড়ি এবং পালকির ব্যবস্থা ছিল।

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন যে ভারতীয়দের দুর্দশার মূল কারণ জনসাধারণের বিশেষভাবে মেয়েদের অশিক্ষা। তিনি বারবার সরকারের কাছে প্রবল যুক্তি সহকারে মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব যাতে সরকারই কাঁধে তুলে নেয় তার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৫৪ সালে উডের প্রতিবেদনে (Wood's Despatch) মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব সরকারকে নিতে বলা হয়। এর ফলে শেষ পর্যন্ত হ্যালিডে (Halliday) মেয়েদের স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে সম্মতি দিতে বাধ্য হলেন। ১৮৫৭ সালে তিনি হুগলি জেলায় ৭টি মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই বছরই তিনি বর্ধমানেও ১টি মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর উৎসাহে ১৮৫৮ সালের ভেতর মেয়েদের জন্য হুগলি জেলায় ২০টি বিদ্যালয়, বর্ধমানে ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি এবং নদিয়া জেলায় ১টি, মোট ৩৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। কিন্তু এর পরই কি সরকার নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত গুটিয়ে নিলে পরবর্তী পর্যায়ে আর কোন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা বন্ধ তো হলই, উপরন্তু প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিও সংকটে পড়ল।

সরকারের অনাগ্রহ দেখে তিনি ''নারী শিক্ষা ভাণ্ডার'' প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভাণ্ডারের অর্থ তাঁকেই

যোগাতে হত। কারণ সাধারণ মানুষ তাঁর মূল্য কোনদিনই বোঝেনি এবং তার অধিকাংশই ছিল নারীশিক্ষার বিরোধী। যাই হোক, নারী শিক্ষা ভাণ্ডারের অর্থে বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হতে থাকল এবং উৎসাহে অনেক গোঁড়া হিন্দুও নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসেন।

শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সংখ্যা দেখে নারী শিক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদানের মূল্যায়ন করলে তা হবে চূড়ান্ত ভুল। এক হাতে একা তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁর সর্বস্ব বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা করেছেন আবার অন্যদিকে পাঠক্রম রচনা, পুস্তক রচনা ও বাংলাভাষাকে একটি গতিশীল আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন যাতে প্রাথমিক স্তরে বাংলাই হতে পারে পঠন পাঠনের মাধ্যমে। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী রচনা করে তিনি ব্যাকরণ শিক্ষার পথ সুগম করে দিলেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল যাবৎ এই দুইটি ছিল বাংলা ব্যাকরণের প্রধান ভিত্তি। তা ছাড়াও, মৌলিক সহজ পাঠ্য রচনা, সংস্কৃত সাহিত্য ও ইংরাজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনুবাদ কর্ম এমন সহজবোধ্য ভাষায় লেখা হয়েছিল যা নবশিক্ষিত মেয়েদের কাছে ছিল সমান আকর্ষণীয়। রাজা রামমোহন রায় যে কাজের সূচনা করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্ব তাকে সার্থক ভাবে কাজে পরিণত করেছিল।

(Ramabai Sarswati, 1858-1922) :

রামাবাঈ এর জন্ম হয় ১৮৫৮ সালে ভারতের পশ্চিমঘাট সংলগ্ন কর্ণাটক রাজ্যে। তাঁর বাবা অনন্ত শাস্ত্রী ছিলেন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি মেয়েদের শিক্ষিত করায় প্রবল আগ্রহী ছিলেন। রামাবাঈয়ের মায়ের নয় বছর বয়সে বিবাহ হয় এবং বিবাহ পরবর্তী সময় স্বামীর ক্যাছ থেকে সংস্কৃত এবং ধর্মশাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন। মা এবং বাবা দুজনের অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহে রামাবাঈ বারো বছর বয়সে পুরাণের ১৮,০০০ শ্লোক মুখস্থ করেন। তিনি নানা শাস্ত্র এবং ভাগবত-এ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য কলকাতার পণ্ডিতগণ তাঁকে ''সরস্বতী'' উপাধি দেন।

পরবর্তী সময় তিনি কলকাতায় আসেন এবং কেশবচন্দ্র সেন ও জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। তিনি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন একজন বাঙালি উকিল বিপিন বিহারী মেধারী মহাশয়ের সঙ্গে। বিপিন বিহারী ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ছিলেন। তবে বিবাহের দুবছরের মধ্যে তিনি বিধবা হন। তখন তাঁর কন্যা সন্তান মনোরমা খুব ছোট।

রামাবাঈ এবং তাঁর স্বামীর স্বপ্ন ছিল বাল্য বিধবাদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার। সেটি বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি আমেরিকা যান। সেখানে নানা ব্যক্তির সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং ''রামাবাঈ অ্যাসোসিয়েশন'' নামে একটি ছোটো সমিতি গঠন করেন, বস্টন শহরে ১৮৮৭ সালে। এই সমিতিটি গোঁড়া খ্রিস্টান মেথডিস্ট্ ব্যবসায়ীদের দ্বারা গঠিত হয় এবং পরবর্তী ১০ বছর তাঁকে ওই সমিতির পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

এই আর্থিক সাহায্য নিয়ে তিনি প্রথম আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন ''সারদা সদন'' নাম দিয়ে। এটি ছিল মহারাষ্ট্রের বিধবাদের জন্য গঠিত প্রথম হোম বা আবাসন। একমাত্র বাংলাতেই তখন এরকম একটি আবাসিক কেন্দ্র ছিল যেটি স্থাপন করেছিলেন কেশব চন্দ্র সেন।

এই সদনের উদ্দেশ্য ছিল বিধবাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা আনা। তাই তাদের নানান রকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। যেমন—শিক্ষিকা, সেবিকা, ধাইমা ইত্যাদি হবার জন্য। সংস্কৃত, গুজরাতি এবং মারাঠি ভাষা পড়ানো হত। এ ছাড়াও ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, নক্ষত্র বিজ্ঞান (astronomy), রসায়ন (chemistry), উদ্ভিদ বিজ্ঞান (botany), জীব বিজ্ঞান (zoology), স্বাস্থ্য ইত্যাদি পড়ানো হত। নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হত। সেলাই, বোনা, আঁকা, ছবি তোলা, মৃৎশিল্প, বাঁশের জিনিস তৈরি ইত্যাদি শেখানো হত।

এই শিক্ষাকেন্দ্রটি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে ক্রমশ অনেক অবিবাহিত মেয়েও ভর্তি হতে লাগল। ১৮৯০ সালে সদনে ১৮ জন আবাসিক বিধবা ছিলেন। সে বছরই সদনটি স্থানান্তরিত করা হল পুনাতে। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ৪৮-এ।

রামাবাঈ ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হয়ে যান। এর ফলে স্থানীয় লোকজনের ভিতর ক্ষোভ এবং সন্দেহ দেখা দিতে থাকে। রামাবাঈ তখন সারদা সদন চালানোর জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করেন যাতে সদনটিকে বিদেশি অনুদানের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে থাকতে হয়। তিনি তারপর খেরগাঁওতে জমি কিনে "মুক্তি সদন" নামে একটি খামার (farm) চালু করেন। ১৯০০ সালে দুর্ভিক্ষের সময় প্রচুর সংখ্যক মহিলাকে উদ্ধার করে এনে এখানে রাখা হয়। পরবর্তীকালে এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র, শিল্প শিক্ষণ বিদ্যালয় (Industrial Training School) স্থাপন করা হয়। সেখানে বাগান, মাঠ, তেলের খনি, দুগ্ধ প্রকল্প, সেলাই, হাতের কাজ, তাঁত বোনা ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থাও করা হয়।

এ ছাড়াও তিনি দুস্থ মহিলাদের জন্য "কৃপা সদন", বয়স্ক, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য, "প্রীতি সদন" এবং অন্ধদের জন্য "বার্তেম সদন" গঠন করেন।

রামাবাঈ বহু দরিদ্র, নীচু বর্ণের মহিলাদের উদ্ধার করে খেরগাঁওতে আশ্রয় দেন। তিনি সরকার দ্বারা গঠিত ১৮৮২ সালের কমিশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেন যেমন মহিলাদের শিক্ষিকা হবার প্রশিক্ষণ দেওয়া, ডাক্তারি পড়বার সুযোগ দেবার ইত্যাদি। তাঁর প্রকাশিত কিছু বই ছিল যেমন "স্ত্রী ধর্ম নীতি" "দ্য হাই কাস্ট হিন্দু উইমেন" ইত্যাদি। তিনি সহজ মারাঠি ভাষায় বাইবেলের নিউ টেস্টমেন্টটিকে অনুবাদ করেন।

রামাবাঈ সরস্বতীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমাজে দুর্বল, অসহায়, নিঃসম্বল মহিলাদের স্বাবলম্বী করে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন, শুধুমাত্র জীবিকার উপযোগী দক্ষতা অর্জন করলেই হবে না, বিদ্যার্জনও প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনায় মেয়েদের একই সঙ্গে বৃত্তিমুখী শিক্ষা এবং কেতাবি বিদ্যাশিক্ষা দান করার এই পরিকল্পনা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁর চিন্তাভাবনা ও তাকে কার্যকর করার এই প্রচেষ্টা এখনও সমান প্রাসঙ্গিক।

(Begum Rokeya, 1880-1932) :

রোকেয়া হোসেন ১৮৮০ সালে এক বর্ধিষ্ণু বাঙালি মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার অত্যন্ত গোঁড়া ছিল। তাঁর বাবা এবং দুই ভাই যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর ভাইরা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেছিলেন মিশনারি কলেজ থেকে। কিন্তু তাঁদের পরিবারের রীতি অনুযায়ী মেয়েদের পর্দার প্রথা চালু ছিল

এবং গৃহে থেকে কেবল আরবি (কোরান পাঠের জন্য) এবং উর্দু শেখার অনুমতি ছিল। বাংলা বা ইংরেজি শেখার অনুমতি ছিল না, কারণ সেটি অ-মুসলমানেরা পাঠ করত। তবে রোকেয়ার দাদা, আবুল ইব্রাহিমের উদার মানসিকতা এবং নারী শিক্ষার প্রতি পূর্ণ সমর্থনের জন্য রোকেয়া লুকিয়ে তাঁর কাছ থেকে বাংলা এবং ইংরেজির পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনে এই দাদা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৬ বছর বয়সে, মধ্য তিরিশের এক বিপত্নীক, উদারমনা, বিহারের জেলাশাসক সায়েদ সেখাওয়াত হুসেনের সঙ্গো তাঁর বিবাহ হয়। সেখাওয়াত অত্যন্ত পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং রোকেয়াকে সাহিত্য চর্চাতে উৎসাহ দান করতেন। ১৯০৯ সালে সায়েদের মৃত্যু হয়। সেই বছরই রোকেয়া সায়েদের স্মৃতিতে ভাগলপুরেই একটি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর জন্য সায়েদ সেখাওয়াত তখনকার দিনে ১০,০০০ টাকা আলাদা করে রেখে গিয়েছিলেন।

১৯১০ সালে রোকেয়ার সৎ জামাইয়ের সঙ্গো বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ লাগে। তখন তিনি ওই বিদ্যালয়টি বন্ধ করে কলকাতায় চলে আসেন। ১৬ই মার্চ ১৯১১ সালে তিনি কলকাতাতে নারী শিক্ষার জন্য ''সেখাওয়াত মেমোরিয়া গার্লস স্কুল'' স্থাপন করেন। স্কুলটি স্থাপনের সময় ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮। ১৮২৫ সালে সেটি দাঁড়ায় ৮৪ জনে। ১৯১৭ সালে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল এবং ভারতের ভাইসরয়ের স্ত্রী মিসেস চেমসফোর্ড স্কুলটি পরিদর্শনে যান। তারপর থেকে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই স্কুলটিকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসেন। ১৯৩০ সালে বিদ্যালয়টিকে দশম শ্রেণি অবধি করা হয়। এই স্কুলে বাংলা এবং ইংরেজি ছিল বাধ্যতামূলক বিষয়।

কলকাতায় থাকাকালীন বেগম রোকেয়া মুসলমান নারীদের শিক্ষার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান। ১৯১৬ সালে বাঙালি মুসলমান মহিলাদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সেটির নাম ছিল ''আনজুমান-এ-খাওয়াতিন-এ-ইসলাম''। ১৯২৬ সালে ''বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশন কনফারেন্স'' এর সভাপতিত্ব করেন। তিনি নারী শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে আলিগড়ে সারা ভারত নারী সভার (All India Women's Conference) অধিবেশন পরিচালনা করার পরেই তিনি মারা যান। সেই সময় তিনি ''নারীর অধিকার'' নামে একটি বই লিখেছিলেন, যেটি আর সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

তাঁর জীবনী একটি পর্দানসীন, গোঁড়া মুসলমান নারীর, যিনি শুধু যে সমাজের আরোপিত বাধ্যবাধকতার ভেতর দিয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন তাই নয়, অন্য নারীদের এগিয়ে যাবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

(Summary) :

এই এককে আমরা চারজন ভারতীয় চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারকদের নিয়ে আলোচনা করেছি। এরা নানা ভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে সাহায্য করেছেন। নারী শিক্ষার জন্য সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপরও এনারা প্রভাব ফেলেছেন। এই চারজনের ভেতর দুজন আছেন যাঁরা নিজেরাই নারী এবং তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে তাঁরা নিজেরাও শিক্ষিত হয়েছেন সঙ্গো অন্য নারীদের কথা চিন্তা করে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবার, শিক্ষার সুযোগ করে দেবার চেষ্টা করেছেন।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরাজি ভাষা এবং তার সঙ্গে হিন্দু শাস্ত্র, কোরান এবং সুফি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে সতীদাহ একটি কুসংস্কার এবং ধর্মের নামে অপপ্রচার। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করাতে সক্ষম হন। তাঁর বিধবা বিবাহের জন্য ও মেয়েদের পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারের জন্য লড়াইও উল্লেখযোগ্য। পুরুষদের বহুবিবাহ প্রথা যে আসল ধর্মের অপব্যবহার তাও তিনি নানা ধর্মগ্রন্থ উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর গঠিত ব্রাহ্ম সমাজের নীতির মাধ্যমে তিনি নারী শিক্ষা ও প্রগতির ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) আধুনিকতা ও ঐতিহ্যকে একসঙ্গে বজায় রাখায় বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ ভেতরে ভালোটাকেই গ্রহণ করা ছিল তাঁর দর্শন। তিনিও রামমোহনের মতো সতীদাহর বিপক্ষে ও বিধবা বিবাহের পক্ষে সোচ্চার হন। তিনি ১৮৫০ সালে মেয়েদের বিদ্যালয়—বেথুন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং নারী শিক্ষাকে সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করার জন্য নানান চেষ্টা করেন। ১৮৫৭ সালে তিনি হুগলি জেলায় ৭টি, বর্ধমানে ১টি মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৮ সালে তাঁর উৎসাহে মেদিনীপুর, নদিয়া, হুগলি ও বর্ধমানে প্রচুর মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সরকারের ওপর আর্থিকভাবে নির্ভর না করে তিনি ‘‘নারী শিক্ষা ভাণ্ডার’’ প্রতিষ্ঠা করেন যা দিয়ে এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করা হয়। বিদ্যাসাগরের কাছে বাংলার নারী শিক্ষা বিশেষভাবে ঋণী।

রামাবাঈ সরস্বতী (১৮৮৫-১৯২২) কর্ণাটকের এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের কন্যা। তাঁর মা এবং বাবার উৎসাহে বারো বছর বয়সের মধ্যে পুরাণের ১৮,০০০ শ্লোক মুখস্থ করেন। তাঁর ‘‘সরস্বতী’’ উপাধিটি কলকাতার পণ্ডিতকুলের দেওয়া। তিনি বিবাহ করেন বাংলার এক ব্রাহ্ম উকিলকে। তিনি মহারাষ্ট্রে প্রথম মেয়েদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন ‘‘সারদা সদন’’ নাম দিয়ে। তার জন্য তিনি আমেরিকাতে একটি তহবিল গঠন করেন ‘‘রামাবাঈ অ্যাসোসিয়েশন’’ নামে। এই তহবিলের টাকা এই বিদ্যালয়ের জন্য দশ বছর ধরে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি পান। এটি প্রথমে ছিল বিধবাদের জন্য গঠিত কেন্দ্র। পরে এই জনপ্রিয়তার জন্য, অবিবাহিত মেয়েরাও আসতে থাকে। তিনি মহারাষ্ট্রে ‘‘মুক্তি সদন’’ বলে একটি খামার ও নানা রকম প্রশিক্ষণের সুবিধা সহ আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ ছাড়াও দুস্থ মহিলাদের জন্য ‘‘কৃপা সদন’’, বয়স্ক ও মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলাদের জন্য ‘‘প্রীতি সদন’’ এবং অন্ধদের জন্য ‘‘বার্তেম সদন’’ স্থাপন করেন। এ ছাড়া তিনি নিজে কিছু বইও লেখেন যেমন ‘‘স্ত্রী ধর্ম নীতি’’, ‘‘দ্য হাই কাস্ট হিন্দু উইমেন’’ ইত্যাদি। তিনি সহজ মারাঠি ভাষায় বাইবেলের নিউ টেস্টমেন্টটিকে অনুবাদ করেন।

রোকেয়া বেগম (১৮৮০-১৯৩২) এক বনেদি, গোঁড়া বর্ধিষ্ণু বাঙালি মুসলমান পরিবারের কন্যা। তাঁদের পরিবারে মেয়েদের গৃহে বসে খালি আরবি এবং উর্দু শেখার অনুমতি ছিল কোরান পাঠ ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য। এমনকি নিজের মাতৃভাষা বাংলা পাঠ করার অনুমতিও ছিল না। এ হেন পরিবারের মেয়ে হয়ে রোকেয়া তাঁর দাদা আবুল ইব্রাহিমের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে লুকিয়ে বাংলা ও ইংরিজি পাঠগ্রহণ করেন। তাঁর স্বামী সায়েদ সেখাওয়াত্ হোসেন একজন অত্যন্ত পণ্ডিত ও উদারচেতা মানুষ ছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে রোকেয়া সাহিত্য চর্চা চালিয়ে যান। স্বামী বিয়োগের পর তাঁরই রেখে যাওয়া টাকা দিয়ে রোকেয়া মুসলমান শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, বিহারের ভাগলপুরে। ১৯১১

সালে সেই স্কুলটিকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন "সেখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল" নাম দিয়ে। সেখানে তিনি বাংলা এবং ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে রাখেন। ১৯১৬ সালে বাঙালি মুসলমান মহিলাদের জন্য একটি সংগঠন করেন "আনজুমান-এ-খাওয়াতিন-এ-ইসলাম" বলে। তিনি নানান বইও লিখেছিলেন। তাঁর অবদান বিশেষ করে মুসলমান নারীদের জন্য অপরিসীম।

(Exercise) :

•

১। রাজা রামমোহনের জন্ম কোন্ সালে?

২। তিনি কত বছর বয়সে মূর্তি পুজোর বিরুদ্ধে লেখেন?

৩। সতীদাহর বিরুদ্ধে আইন কবে জারি হয়?

৪। ঈশ্বরচন্দ্রকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি কবে দেওয়া হয়?

৫। বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলে কবে এবং কোন্ পদে যোগদান করেন?

৬। ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর কী করেন?

৭। "নারী শিক্ষা ভাণ্ডার" স্থাপনের কারণ কী।

৮। রামাবাঈ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? কোন্ সালে?

৯। তাঁকে "সরস্বতী" উপাধি কারা দেন?

১০। রামাবাঈ বারো বছর বয়সে কী করেন?

১১। "রামাবাঈ অ্যাসোসিয়েশন" কবে এবং কোথায় স্থাপিত হয়?

১২। রোকেয়া বেগম কলকাতায় কোন্ বিদ্যালয় স্থাপন করেন?

১৩। কোন্ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন?

১৪। কোন্ সালে বিদ্যালয়টি দশম শ্রেণি অবধি স্বীকৃতি পায়?

•

১। রাজা রামমোহনের নারী শিক্ষায় যে অবদান তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। বিদ্যাসাগর সম্পাদক থাকাকালীন বেথুন স্কুলের কর্মসূচির বর্ণনা দিন।

৩। "সারদা সদন" কে, কোথায়, কবে এবং কেন স্থাপন করেন? সেখানে কী ধরনের কাজ হত?

৪। বেগম রোকেয়ার জীবনে কে বা কারা শিক্ষা ক্ষেত্রে কেমন ভাবে সাহায্য করেছিলেন তার বর্ণনা দিন।

•

১। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় শিক্ষাবিদদের অবদান আলোচনা করুন।

২। ভারতীয় মহিলারা কীভাবে নারী শিক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন আলোচনা করুন।

❑

(Major Constraints of Women's Education, Social, Political, Psychological, Economic and Religious)

(Structure)

(Introduction) :

আমরা দেখতে পাই যে নারী শিক্ষা এবং নারীর সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থান একে অপরের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পূর্ববর্তী এককগুলিতে আমরা দেখেছি যে কীভাবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ করেছি যে এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে নারী শিক্ষার ওপর। অর্থাৎ নারীদের শিক্ষার সুযোগের ওপর এবং সেটি আবার প্রভাব ফেলেছে নারীর সামাজিক অবস্থানের ওপর। ভারতবর্ষে ধর্ম ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের সামাজিক চিন্তা, ভাবনা এবং কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই নিয়ন্ত্রণ আবার প্রভাবিত করেছে নারীর সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থানকে এবং তাঁর শিক্ষা প্রাপ্তিকে। এই এককে আমরা দেখব যে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কি কি কারণ। যদিও কারণগুলিকে আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করব, কিন্তু এরা সবকটিই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল এবং একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে।

(Objectives) :

এই একক থেকে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা বা সমস্যা কোন্ কোন্ দিক থেকে আসে, যেমন—

- সামাজিক
- রাজনৈতিক
- আর্থিক
- ধর্মীয়
- মানসিক

(Social Problem) :

আমাদের সমাজ পুরুষ শাসিত সমাজ। এই সমাজে ব্যতিক্রম বাদ দিলে সামগ্রিক ভাবে নারীর সামাজিক অবস্থান খুবই নীচে। এখনো কন্যা ভ্রূণ হত্যা ব্যাপকভাবে ঘটে যার জন্য জনসংখ্যায় নারী ও পুরুষের অনুপাত বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে। কন্যা সন্তান এখনও অবাঞ্ছিত। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। পরিবারে ছেলে এবং মেয়ের প্রতি আচরণেও প্রভেদ দেখা যায়। তাই শিক্ষা অর্জনের সুযোগ মেয়েদের থেকে ছেলেদের বেশি দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবহেলিত থাকায় মেয়েদের প্রকৃত আত্মমর্যাদা বোধকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ছদ্ম আত্মমর্যাদা বোধ। অর্থাৎ মেয়েদের এই সামাজিক অবস্থা নারী শিক্ষা বিস্তারে একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

সামাজিক রক্ষণশীলতা, বিশেষ করে মুসলমান, অনগ্রসর সম্প্রদায় ও উপজাতির মধ্যে, নারী শিক্ষা প্রসারে বাধার সৃষ্টি করে। বাল্য বিবাহ এখনো অনেক জায়গায় ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। বিবাহের নিম্নতম বয়স সম্পর্কে আইন থাকলেও এরা হয় এই আইন সম্পর্কে অবহিত নয়, অথবা এই আইন প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক নয়। সেক্ষেত্রেও কুসংস্কার, ঐতিহ্য (Tradition), সামাজিক রীতি (Social custom) ইত্যাদি নানা অজুহাত বাল্যবিবাহের মত কুপ্রথাকে এখনও প্রচলিত ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছে। দরিদ্র জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশ মনে করে মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিবাহ হলে মেয়েরা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে এবং তাদেরও কিছুটা আর্থিক সুরাহা হবে। কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সম্পন্ন পরিবারের ছেলে মেয়েদেরও বাল্যবিবাহ দেওয়ার রেওয়াজ প্রবলভাবে বিদ্যমান। বলাবাহুল্য নারী শিক্ষার অন্যতম প্রধান অন্তরায় হল বাল্যবিবাহ প্রথা ও সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যাগুলি। অপরিণত বয়সে মাতৃত্ব সন্তান পালনের প্রধান সমস্যা। অপরিণত মায়েদের অভিজ্ঞতা ও দায়িত্ব সচেতনতার অভাব। অজ্ঞতা এবং বহু সন্তানের জন্ম দেওয়ার ফলে পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষা প্রচণ্ড ভাবে ব্যাহত হয়। বলা বাহুল্য, এর জন্য প্রধানত দায়ী পুরুষ সমাজ।

নিরক্ষর মায়েরা অনেক সময়ই সন্তানের সাক্ষরতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান। এই সব মায়েরা বিশ্বাস করেন মেয়েদের ঘরের কাজে পটু করে বিবাহ দেওয়াই তাদের দায়িত্ব। বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে সাক্ষর করা মানে

বৃথা সময় এবং অর্থের অপব্যয় করা। অর্থাৎ এই সব অভিভাবকেরা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ অবহিত নন। শুধু তাই নয়। নিরক্ষর পরিবারে বিদ্যালয়ে পড়ার প্রস্তুতি হিসাবে যে শিক্ষা পাওয়া দরকার তার অভাব। বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগে যতটা ভাষার দক্ষতা অর্জন করা দরকার, সংখ্যা সম্বন্ধে যে প্রাথমিক ধারণা তৈরি হওয়া দরকার অথবা মানসিক, শারীরিক ও সঞ্চালনমূলক বিকাশ হওয়া দরকার নিরক্ষর পরিবারে তা হয় না। সুতরাং বিদ্যালয় সম্বন্ধে শিশুদের মধ্যেও কোন আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। পিতামাতার অজ্ঞতা ও অনীহা এবং সেই সঙ্গে ছোটোদের অপরিণত অবস্থা এই দুইটি মিলিত হয়ে শিক্ষার প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। যদিও এই ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তবুও কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে এর ব্যাপকতা ও স্থায়িত্ব অনেক বেশি।

স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সামাজিক বাধা সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রায় অপরিবর্তনীয় ধারণা (Sex role stereotyping)। কোন্ কোন্ বৃত্তি ও পাঠক্রম মেয়েদের জন্য, কোন্‌গুলি পুরুষদের জন্য তা সামাজিক ভাবে পূর্বনির্দিষ্ট। বর্তমানে মেয়েরা সমস্ত বিষয়ে এগিয়ে এলেও সামগ্রিকভাবে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি ও পাঠক্রম অনেক সময়ই সীমাবদ্ধ, বৈচিত্র্যহীন ও তাদের আগ্রহ সৃষ্টির পরিপন্থী। এর ফলে মেয়েদের পক্ষে নিজেদের মেলে ধরার ক্ষেত্রটি হয়ে পড়ে সংকুচিত। তা ছাড়াও কঠিন পরিশ্রম সাপেক্ষ পাঠক্রম ও বৃত্তি গ্রহণ করার পরও মেয়েরা সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায় না বা সমান অংশীদার হতে পারে না। এর ফলে অনেকেই শিক্ষা অসমাপ্ত রাখে বা সমাপ্ত করলেও তা কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করে না।

অনেক গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট এখনও অনেক ক্ষেত্রে দুর্গম এবং যানবাহনের সুযোগ সুবিধা কম। বাসস্থান থেকে স্কুলগুলিও অনেক ক্ষেত্রে বেশ দূরে। এটি স্কুল যাতায়াতের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করে, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। সর্বশিক্ষা অভিযান নামক পরিকল্পনায় এই বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন স্কুল স্থাপনের জন্য উৎসাহ ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তবুও এখনও তুলনামূলক ভাবে মেয়েদের স্বাক্ষরতার হার কম।

শহরে মেয়েদের জন্য যত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে গ্রামাঞ্চলে তা হয়নি। ছেলে এবং মেয়ের একসঙ্গে শিক্ষালাভ করাটা এখনো অনেক রক্ষণশীল মানুষ মেনে নিতে পারেন না, তাই তারা তাদের মেয়েদেরে স্কুলে পাঠান না অথবা পাঠালেও যত দ্রুত সম্ভব নানা অজুহাতে তাদের পড়া শেষ করে দিতে চান।

এখনো ভারতীয় সমাজে মনে করা হয় যে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে মা বাবার প্রধান কর্তব্য। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে ঘরকন্না করা এবং সন্তান লালনপালন করাই হচ্ছে মেয়েদের মূল সামাজিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এর ফলে বহু মেয়ে স্কুল বা কলেজে ভর্তি হলেও পড়া শেষ করতে সক্ষম হয় না। তাই অপচয় এবং অনুন্নয়ন হচ্ছে নারী শিক্ষার এক প্রধান সমস্যা।

২০০৫-এর UNESCO রিপোর্ট এ দেখা যাচ্ছে যে শৌচালয় ব্যবস্থা (Sanitation) এবং পানীয় জল না থাকায় বিপুল সংখ্যক মেয়েদের পক্ষে দীর্ঘকাল স্কুলে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে স্কুলছুট মেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অপচয় ঘটছে সর্বস্তরে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষেও এই সব বিদ্যালয়ে

বেশিদিন কাজ করা সম্ভব হচ্ছেনা। অনুপস্থিতির হার বেশি হওয়ার দরুন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও স্কুলে যাওয়ার উৎসাহ থাকছে না। এই বাধাগুলি মূলত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক হলেও এর মধ্যে দিয়ে একধরনের সামাজিক উদাসীনতার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। কারণ বিদ্যালয় স্থাপন ও তার পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বস্তরের অংশীদারি থাকলে, এই জাতীয় সমস্যার সমাধান সহজেই হওয়া সম্ভব। কিন্তু গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় কার্যত তা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণ মানুষ তার সামিল হতে কখনই উৎসাহ বোধ করেনা।

(Political Problem) :

ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে যে ১৪ বছর অবধি প্রত্যেক শিশুর জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল ১৯৬৫। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। ১৯৯৩ সালে উন্নিকৃষ্ণাণ মামলায় "Right of Education" অর্থাৎ শিক্ষার অধিকারকে "Right to Life" বা জীবনের অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ফলে ২০০১ সালে শুরু হয় ''সর্বশিক্ষা অভিযান" এর কর্মসূচি। যদিও সর্বশিক্ষা অভিযানে ছেলে ও মেয়ের শিক্ষায় কোন প্রভেদ করা হয়নি, তবুও ছাত্রীদের শিক্ষার হার এখনও ছাত্রদের তুলনায় কম। এর অন্যতম কারণ ছাত্রীদের যাবার উপযোগী স্কুল অনেক ক্ষেত্রেই নেই, বিশেষ করে গ্রামের দিকে। যদিও সমস্ত স্কুলেই সহ শিক্ষার সুযোগ আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্কুলে শুধু শিক্ষকরাই আছেন, শিক্ষিকা না থাকায় রক্ষণশীল মা বাবারা অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠায় না। সর্বশিক্ষা অভিযান এবং মিড-ডে মিলের ব্যবস্থার জন্য যদিও স্কুলে ভর্তিও উপস্থিতির হার বেড়েছে, কিন্তু পরিকাঠামোর অভাব সম্পূর্ণ দূর করা যায়নি। ফলে বসার জায়গা নেই, পড়ানোর শিক্ষক/শিক্ষিকা নেই, অথবা কেবল একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার অধীনে প্রায় ১৫০টি ছাত্র-ছাত্রী। একক শিক্ষক বা শিক্ষিকা বিশিষ্ট স্কুলে পড়ানোর জন্য তাদের কোন বিশেষ শিক্ষণ ব্যবস্থা নেই। ফলে পড়াবার আগ্রহ নেই। এই অবস্থায় শিক্ষার্থীদেরও স্কুলে আসার আগ্রহ কমে যায় এবং দেখা যায় যে একটি বয়সের পর মেয়েদের মধ্যে স্কুলছুট ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই অবস্থা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যা বা পরিচালনার অব্যবস্থার দরুন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে এর অনেকটাই রাজনৈতিক সমস্যা।

রাজনৈতিক ভাবে যখন কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা স্থির করা হয় তখন তা কোন উপস্থিত পরিস্থিতির ভিত্তিতে দ্রুত কার্যকর করার প্রয়োজনে গৃহীত হয়, অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গুণগত মানের চেয়েও সংখ্যার গুরুত্ব বেশি। সেই কারণে প্রায়ই দেখা যায় পরিকল্পনা হয় অসম্পূর্ণ না হলে নানা ফাঁক ফোকরে ভর্তি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি প্রায়ই খুব গভীর ভাবে বিচার করা হয় না। এর ফলে সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা ফলপ্রসূ হয় না। মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষায় রাজনৈতিক বাধা এটাই।

দ্বিতীয় রাজনৈতিক বাধা দল নির্ভর রাজনীতি ও সরকার পরিচালনা পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত। বর্তমান ব্যবস্থায় যে রাজনৈতিক দল যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকে, সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক দায়দায়িত্ব তাদের উপরই ন্যস্ত থাকে। অন্য যারা তারা শুধু পর্যবেক্ষক—কখনও নির্লিপ্ত, কখনও বা শুধুই ছিদ্রান্বেষী। এর ফলে নারী শিক্ষার মত প্রয়োজনীয় বিষয়, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন

ও সংস্কার, কোন কিছুতেই একটা সম্মিলিত প্রয়াস সৃষ্টি হতে পারে না। ঘনঘন সরকার পরিবর্তন হলে এই অবস্থা আরও খারাপ হয়। একটা সার্বিক আন্দোলন সৃষ্টি না হলে, সবকিছুতেই মতভেদকে প্রাধান্য দিলে, কোন সাফল্যই অর্জন করা সম্ভব নয়।

আর একটি রাজনৈতিক বাধা অনেক ক্ষেত্রেই নারীশিক্ষার অন্তরায় হিসাবে দেখা দেয়। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার দরুন একটি সৎ, স্বচ্ছ ও গতিশীল কার্যক্রম গ্রহণ করা ও তা সচল রাখা প্রায়ই দুরূহ হয়ে পড়ে। নারীশিক্ষা তথা সমাজের দুর্বলতর অংশের শিক্ষার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হয় তার সবটাই শেষ পর্যন্ত সার্থক ভাবে ব্যয় করা সম্ভব হয় না। ব্যয় হলেও তার সবটা সুফল তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছায় না। বিষয়টি প্রশাসনিক সর্বোচ্চ স্তরে জানা থাকলেও রাজনৈতিক কারণে তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে যদি এই একটি মাত্র বিষয়ের প্রতিকার করা সম্ভব হত তবে অনেকদিন আগেই সার্বিক সাক্ষরতার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যেত।

(Economic Problem) :

রাজনৈতিক বাধা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এক ধরনের আর্থিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বরাদ্দ অর্থের সদ্ব্যয় না হওয়াটা যে একধরনের আর্থিক সমস্যাও সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা আরও জটিল।

প্রথমত, দারিদ্র্য এক বৃহৎ সমস্যা। একথা ঠিক যে শিক্ষাই দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রধানতম হাতিয়ার এবং শিক্ষাই পরিবার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আর্থিক সুস্থিতি নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু বিপরীত ক্রমে, দারিদ্র্য শিক্ষার প্রধান বাধা। দরিদ্র পরিবারে বহু সন্তান থাকলে, আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা অভিভাবকরা মনে করেন যে মেয়েকে শিক্ষা নিতে পাঠানোটা অপব্যয়। তার থেকে তাকে গৃহের কাজে লাগিয়ে বা অন্যের গৃহে সহায়িকার কাজ করতে পাঠিয়ে উপার্জন করাটাকে তারা বেশি পছন্দ করে।

বহু সন্তানবিশিষ্ট পরিবারে, ঘন ঘন সন্তানের জন্ম হওয়ায়, পরিবারের অপেক্ষাকৃত বড়ো মেয়েদের ওপর ছোটোদের লালনপালনের ভার পড়ে। সংসারের কাজে সাহায্য করে, ছোটোদের লালন পালনের দায়িত্ব পালন করে তাদের পক্ষে লেখাপড়া করা হয়ে ওঠে না।

দারিদ্র্য ও বহু সন্তানের জন্ম দেওয়ার ফলে, মায়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না। সন্তানরাও অপুষ্টি, অজ্ঞতা ও স্বাস্থ্যহীনতার দরুন বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। দ্বিপ্রাহরিক আহার ও কিছু কিছু স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও, এই সমস্যা এখনও অনেকটাই আছে। যখন স্কুলে দুপুরে পাউরুটি জাতীয় খাবার দেওয়া হত তখন বড়ো মেয়েদের প্রতি নির্দেশ থাকত যেন তারা নিজেরা না খেয়ে ছোটো ভাইবোনের জন্য তা বাড়িতে নিয়ে আসে। এই ধরনের নানা কারণে মেয়েদের পড়া শুরুতেই অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়।

যদিও প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার আনুষঙ্গিক খরচ যেমন, বিদ্যালয় কাছে না হলে যাতায়াত করার ব্যয় খাতা, পেনসিলের খরচ ইত্যাদি বহন করাও আমাদের দেশের অনেক অভিভাবরদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। আমাদের দেশে ছেলেমেয়ে প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য দেখা যায়। ছেলেদের ক্ষেত্রে যদিও বা এই আর্থিক প্রতিবন্ধকতাটাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করা হয় এই ভেবে যে

শিক্ষিত হলে ছেলেরা বড়ো হয়ে রোজগার করবে এবং সংসারের ভার নেবে, মা বাবার দেখাশোনা করবে, মেয়েদের ক্ষেত্রে এটিকে অপব্যয় হিসেবেই ভাবা হয়। কারণ এখনও বিশেষ করে নিম্ন আর্থ সামাজিক পরিবারগুলিতে মেয়েদের বিয়ে দেওয়াই মা বাবার কর্তব্য বলে ধরা হয়। সে ক্ষেত্রে পয়সাটা রাখা হয় তাদের বিয়ের যৌতুকের জন্য।

অর্থনৈতিক কারণে দরিদ্র মানুষের মধ্যে স্থানান্তরে যাওয়ার প্রবণতা বেশি। চাষের সময় বা ধান কাটার সময় অনেক কৃষি মজুর সপরিবারে নিজের এলাকা ছেড়ে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন অঞ্চলে মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে যায়। এই সময় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ থাকে। পূর্বোক্ত কারণগুলি স্থানান্তর গমনের প্রবণতার সঙ্গে যোগ করলে দেখা যাবে এর ফলে মেয়েদের শিক্ষাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি। অবশ্য ছেলেরা একটু বড় হয়ে কাজে লাগলে তাদের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি ঘটে।

এ ছাড়াও দারিদ্র্য ও অশিক্ষার ফলে শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা কম। শিক্ষার জন্য কোন সহায়তা দান করা বা অনুকূল পরিবেশ তাদের স্বপ্নেরও অতীত। শিক্ষার জন্য যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে দরিদ্র মানুষের কোন ধারণা না থাকায় তারা স্বেচ্ছায় ওই সব সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না।

এই সব কারণে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মেয়েদের শিক্ষা।

(Religious Problem) :

কোন ধর্মই কিন্তু নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়। প্রথম এককে আমরা দেখেছি যে প্রাচীন ভারতে নারীর সামাজিক মর্যাদা এবং শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে কোন পার্থক্য ছিল না। এমনকি উপনয়নের প্রথাও চালু ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অপব্যবহার এবং অপব্যাখ্যা আরম্ভ হয়। নারীকে পরনির্ভরশীল, অশিক্ষিত, পর্দানশিন করা হতে থাকে। ধর্ম যখন থেকে শুধুমাত্র ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে বিচরণ না করে দৈনন্দিন জীবন, আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক বিধিনিষেধ ইত্যাদির মধ্যে অনুশাসন আরোপ করতে শুরু করে, তখনই নারী সমাজকে শৃঙ্খলিত করার প্রবণতা দেখা যায়। প্রাচীন ভারতে মনুদের সময় থেকে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নারী সমাজ অশিক্ষিত, পুরুষ নির্ভর, অন্তঃপুরে আবদ্ধ হতে থাকায় সেই সুযোগে আরও নতুন বাধা নিষেধ আরোপ করা হতে থাকে। ধর্মের অপব্যাখ্যা বা স্বার্থান্বেষী মানুষের সুবিধাজনক ব্যাখ্যা মধ্যযুগীয় সমাজে প্রবলভাবে নারী সমাজকে অশিক্ষার অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল।

মধ্যযুগীয় বাংলায় বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথা ও পরবর্তীকালীন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথাগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মুসলিম সমাজের শরিয়তি বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলাপরায়ণ, সৎ ও সরল জীবন যাপনের উপযোগী নির্দেশাবলী সমাহার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনগুলি প্রায়শই স্বার্থান্বেষী মানুষের সুবিধার জন্য মেয়েদের উপর নানা অযৌক্তিক বিধিনিষেধে পরিণত হয়। তার জন্যই মুসলিম নারী সমাজ এখনও অনেকটা অনগ্রসর। এখনও ধর্মীয় অনুশাসন গ্রামাঞ্চলে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার প্রধান বাধা।

(Psychological Problem) :

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে সমস্যাগুলিকে নিয়ে আলোচনা করলাম, তার থেকে দেখা যাচ্ছে সবগুলির পেছনেই আসলে রয়েছে এক ধরনের মানসিক সমস্যা। মানসিক সমস্যার কেন্দ্রে আছে মেয়েদের সম্বন্ধে নেতিবাচক অর্থাৎ চিন্তাধারার সমস্যা (attitude), মেয়েরা দুর্বল, জটিল চিন্তা ও কঠিন সমস্যার ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল, অনুকম্পার পাত্রী কিন্তু কখনই পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে গণ্য করার যোগ্য নয়, মেয়েরা শুধু প্রসাধন ও ঘরোয়া বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে ভালোবাসে, সংসার সন্তান প্রতিপালন তাদের একমাত্র কাজ ইত্যাদি অসংখ্য নেতিবাচক দৃঢ় বিশ্বাস ও মনোভাব এমন ভাবে অধিকাংশ মানুষের মনে স্থায়ীভাব আশ্রয় করে আছে যে বহু আধুনিক মানুষও মনে করেন মেয়েদের লেখাপড়া হলে ভালো, না হলেও ক্ষতি নেই। অথবা, বেশি লেখাপড়া করলে বিয়ে দেওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

এই ধরনের মনোভাবেই প্রতিফলন দেখা যায় উচ্চতর শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে। কলা, জীববিদ্যা, সাহিত্য বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিদ্যার বিশেষ বিশেষ শাখা, শিক্ষকতা জাতীয় পেশা, এরকম কিছু বিষয় মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট। এক সময়ে এমন কথাও গবেষণার মাধ্যমে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছিল যে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বুদ্ধি কম। এই ধরনের বিশ্বাস ও ধারণা মেয়েদের মধ্যেও দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান যা কাটিয়ে উঠে স্বাবলম্বী, স্বাধীন মানুষ হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা যাঁরা করতে পেরেছেন একমাত্র তাঁরাই শিক্ষা, বৃত্তি ও সামাজিক মর্যাদায় পুরুষের পাশাপাশি উঠে আসতে পেরেছেন। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে এই বাধা এখনও ব্যাপক।

মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি মানসিক বাধা, সামাজিক রীতি নীতি, আচার অনুষ্ঠান, সামাজিকতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের দায় শুধুমাত্র মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত থাকায় মেয়েরাও বিশ্বাস করেন এগুলি তাঁদেরই একান্ত নিজস্ব। এই কারণে বাড়ির পুরুষ সন্তানের পাঠচর্চা ব্যাহত না হলেও, মেয়ের বেলায় অনেক সময়ই সময়ের অপচয় হতে দেখা যায়। এই কারণেও গ্রামাঞ্চলে এখনও ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে স্কুলছুটের সংখ্যা বেশি।

আমাদের দেশে পুরুষ সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সর্বজনবিদিত। ছোটো থেকেই পুরুষ সন্তানকে এমন ভাবে প্রতিপালন করা হয় যে সে মেয়েদের প্রতি অবহেলার মনোভাব নিয়েই বড়ো হয়। ছোটো থেকেই সে ভাবতে শেখে ছেলে হিসাবে মেয়েদের চেয়ে তার স্থান উচ্চে। বর্তমান সমাজে শুধু বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেই নয় সামাজিক, কর্মক্ষেত্রে, পারিবারিক ইত্যাদি যতরকম নিগ্রহ মেয়েদের সহ্য করতে হয় তার মূলে আছে ছোটোবেলা থেকে গড়ে ওঠা শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব, অবহেলা ও অশ্রদ্ধার মনোভাব।

এখনও পণপ্রথার দরুন মেয়ের বিবাহে বিপুল পরিমাণ যৌতুক দিতে হয়, কন্যা ভ্রূণ হত্যা করা হয়, কন্যা সন্তান জন্মালে তাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ কন্যা মানে একটি বোঝা, যাকে নিজের দায়িত্ব থেকে অন্যের দায়িত্বে হস্তান্তরিত করতে হয় এবং তার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই এখনো কন্যার মা-বাবারা শিক্ষার পেছনে অর্থের অপব্যয় না করে সেটিকে বিবাহের জোগান হিসেবে রেখে দেওয়াটা পছন্দ করেন।

সামাজিক ও মানসিক পরিস্থিতির দরুন অনেক মেয়ের ক্ষেত্রেই উচ্চ শিক্ষা লাভের পরও সাংসারিক

দায় দায়িত্বের একঘেয়েমিতে জীবন কাটাতে হয়, কোন বৃত্তি অবলম্বন করা সম্ভব হয় না। এর ফলে যে হতাশা ও মানসিক শূন্যতা বোধ তৈরি হয় দৃষ্টান্ত হিসাবে তা অন্য মেয়েদের কাছে খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। ফলে অনেক মেয়েই উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

সবশেষে বলা যায় মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মনোসামাজিক (Psychosocial) বাধা, তার জটিল স্বরূপটি নিয়ে এখনও সেরকমভাবে ব্যাপক চর্চা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি অতিসরলীকৃত ধারণার ভিত্তিতে তা বিচার করা হয়। এই বাধা দূর করতে হলে, তার জটিলতার রূপটি যথাযথ ভাবে অনুধাবন করা সর্বাগ্রে দরকার।

(Summary) :

এই এককে আমরা নারী শিক্ষার নানান সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করলাম। যদিও এগুলিকে সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, ধার্মিক এবং মানসিক বলে আলাদা করে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, এরা একে অপরের সঙ্গে জড়িত। সমস্যাটি সামগ্রিক। কোন ক্ষেত্রে একটি বেশি প্রাধান্য পায় অন্যগুলির থেকে। যেমন আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে মানসিকতার। এই মানসিকতা তৈরি হয় সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং ধার্মিক চিন্তাধারা এবং পরিস্থিতির প্রভাবে।

ফলে, নারী শিক্ষার অগ্রগতি আনতে গেলে সামগ্রিকভাবে সমস্যাগুলিকে দেখতে হবে। অভিভাবকদের সজাগ করা, আরো বেশি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা, প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষার সাযুজ্য রচনা করা, পাঠ্যক্রমে বৈচিত্র আনা, অবৈতনিক নারী শিক্ষার সুযোগ, ছাত্রী নিবাসের ব্যাপক ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি স্ত্রীশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে অভিভাবকদের মনোভাবের পরিবর্তনের দিকে নজর দিতে হবে।

(Exercise) :

-

১। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলিকে কোন্ কোন্ আঙ্গিকে দেখা যেতে পারে তার নাম উল্লেখ করুন।

-

১। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক সমস্যাগুলি কী?

২। নারী শিক্ষায় রাজনৈতিক বাধা কোন্‌গুলি?

৩। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্ম কীভাবে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

৪। আর্থিক সমস্যা কীভাবে নারী শিক্ষাকে বাধা দেয়?

৫। নারী শিক্ষা আনতে গেলে মানসিকতার-পরিবর্তন প্রয়োজন—এটি সম্বন্ধে লিখুন।

-

১। ভারতে নারী শিক্ষার প্রসারে যে নানা বাধা রয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

❑

(Women's Education, Literacy and Population Growth. UNESCO documents) :

(Structure)

(Introduction) :

যে-কোনও জাতির অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন সম্পদের। আর্থিক সম্পদ, ভূমি সম্পদের সঙ্গে এখন মানব সম্পদের ওপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মানবকে সম্পদে পরিণত করতে গেলে প্রয়োজন শিক্ষার। সেই শিক্ষা যেমন ছেলেদের প্রয়োজন তেমনি মেয়েদেরও প্রয়োজন। দেখা গেছে যে নারী শিক্ষিত না হলে পরিবার এবং পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষায় বাধার সৃষ্টি হয়। নারীকে আরো বেশি সামাজিক সচেতন ও স্বনির্ভর করতে পারে যা সামাজিক উন্নতির সহায়ক হয়।

UNESCO ১৯৪৬ এ তার জন্মলগ্ন থেকেই শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছে। কারণ তারা বুঝেছিল যে শিক্ষার মাধ্যমেই আনা যাবে সর্বস্তরে সামাজিক অংশগ্রহণ। তার থেকেই আসবে সামাজিক সচেতনতা। তাই-ই আবার সাহায্য করবে সামাজিক সমস্যা সমাধানে। এবং এর জন্যই প্রয়োজন নারী জাতির শিক্ষা। কারণ নারীরা সমাজের অর্ধেক অংশ।

১৯৯০ এ জম্‌টিন (Jomtein, Thailand) থাইল্যান্ড-এর সম্মেলনে সবার জন্য শিক্ষা এবং মেয়েদের শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তখন ধরা হয়েছিল ২০০০ সালের মধ্যে ''সবার জন্য শিক্ষা'র ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু ২০০০ সালে ডাকার (Dakar) এ যে বিশ্ব শিক্ষা গোষ্ঠীর (World Education Forum) অধিবেশন হয়েছিল তাতে দেখা গেল যে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়নি। তাই নতুন লক্ষ্য মাত্রা হিসাবে ঠিক করা হয় ২০১৫। এই এককে আমরা নারী শিক্ষার সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তথা সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক দেখব এবং UNESCO-র দলিলগুলিতে কী রয়েছে তা আলোচনা করব।

সর্বশিক্ষা অভিযান কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর ভারতীয় নারীদের সাক্ষরতার হার অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এখনও পুরুষদের তুলনায় নারীদের সাক্ষরতার হার খুবই কম। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যতরকম বাধা আছে, তা সাক্ষরতার স্তর থেকেই প্রবল ভাবে কার্যকর। অগ্রসর, শিক্ষিত ও উন্নত সমাজের অনীহা, উদাসীনতা ও দুর্নীতি নারী সাক্ষরতার এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। নীচে ৫.১ নং সারণিতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রতিটি রাজ্যের নারী ও পুরুষের মিলিত সামগ্রিক সাক্ষরতার হার এবং নারীদের সাক্ষরতার হার দেওয়া হল। প্রতিটি রাজ্যের ক্ষেত্রে যে জেলাতে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে কম তাদের নাম ও সাক্ষরতার শতকরা হিসাব দেওয়া হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত তথ্যের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে এখনও দেশের কোনো কোনো জেলাতে নারী সাক্ষরতার হার শতকরা ১৮.৬ (কিষনগঞ্জ, বিহার)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ সাক্ষরতার হার ৯৬.৩% (আইজল) এক দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে, কোনো আধুনিক বৃহত্তম নগরীতে নয়।

*	%		%	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
অন্ধ্রপ্রদেশ	হায়দারাবাদ (৭৮.৮)	মেহবুবনগর (৪৪.৪)	হায়দারাবাদ (৭৩.৫)	মেহবুবনগর (৩১.৯)
অরুণাচল প্রদেশ	পাপুম পারে (৬৯.৩)	পূর্বসিয়াং (৪০.৩)	পাপুমপারে (৬০.৪)	টিরাপ (২৮.৮)
অসম	যোরহাট (৭৬.৩)	ধুবড়ি (৪৮.২)	যোরহাট (৬৮.৫)	ধুবড়ি (৪০.০)
বিহার	পাটনা (৬২.৯)	কিষনগঞ্জ (৩১.১)	পাটনা (৫০.৮)	কিষনগঞ্জ ১৮.৬)
চণ্ডীগড়	চণ্ডীগড় (৮১.৯)	—	চণ্ডীগড় (৭৬.৫)	—
ছত্তিশগড়	রাজনন্দগাঁও (৭৭.২)	দান্তেওয়াড়া (৩০.২)	রাজনন্দগাঁও (৬৭.৭)	দান্তেওয়াড়া (১৮.৬)
দিল্লি	পূর্ব দিল্লি (৮৪.৯)	উত্তরপূর্ব দিল্লি (৭৭.৫)	পূর্ব দিল্লি (৭৯.৩)	উত্তরপূর্ব দিল্লি (৬৮.৯)
গুজরাট	আহমদাবাদ (৭৯.৫)	দোহাদ (৪৫.২)	আহমদাবাদ (৭০.৮)	দোহাদ (৩১.৩)

*	%		%	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
হরিয়ানা	আম্বালা (৭৫.৩)	ফতেহাবাদ (৫৮.০)	কুরুক্ষেত্র (৬৭.৪)	ফতেহাবাদ (৫৮.০)
হিমাচল প্রদেশ	হামিরপুর (৮২.৫)	চাম্বা (৬২.৯)	হামিরপুর (৭৫.৭)	চাম্বা (৪৮.৮)
জম্মু ও কাশ্মীর	জম্মু (৭৭.০)	বাড়গাঁও (৪২.৫)	জম্মু (৬৮.৫)	কুপওয়াড়া (২৮.৭)
ঝাড়খণ্ড	পূর্বসিংভূম (৬৮.৮)	পাকুড় (৩০.৬)	পূর্বসিংভূম (৪৭.৩)	পাকুড় (৩০.৬)
কর্ণাটক	দক্ষিণ কন্নড় (৮৩.৩)	রায়চুর (৪৮.৮)	বেঙ্গালুরু (৭৭.৫)	রায়চুর (৩৫.৯)
কেরালা	কোট্টায়াম (৯৫.৮)	পালাক্কাড় (৮৪.৩)	কোট্টায়াম (৯৪.৩)	কাসারগড় (৭৯.১)
মধ্যপ্রদেশ	নরসিংহপুর (৭৭.৭)	ঝাবুয়া (৩৬.৯)	নরসিংহপুর (৬৮.৫)	ঝাবুয়া (২৫.৭)
মহারাষ্ট্র	মুম্বাই (৮৬.৯)	নন্দুরবার (৫৫.৮)	মুম্বাই শহরতলি (৮১.৪)	নন্দুরবার (৪৫.২)
মেঘালয়	পূর্বখাসি হিল (৭৬.১)	পশ্চিমগারো হিল (৫৩.৭)	পূর্বখাসি হিল (৭৪.৮)	পশ্চিমগারো হিল (৪৪.১)
মিজোরাম	আইজল (৯৬.৫)	লঙ্ট্লাই (৬৪.৭)	আইজল (৯৬.৩)	লঙ্ট্লাই (৫৭.৮)
নাগাল্যান্ড	মোককচঙ্ (৮৩.৯)	মোন (৪১.৮)	মোককচঙ্ (৮১.৬)	মোন (৩৬.৩)
ওড়িশা	খুর্দা (৭৯.৬)	মালকানগিরি (৩০.৫)	খুর্দা (৭০.৪)	মালকানগিরি (২০.৯)
পণ্ডিচেরি	মাহে (৯৫.৭)	ইয়ানম (৭৩.৭)	মাহে (৯৫.৭)	ইয়ামন (৬৮.৫)
পাঞ্জাব	হোশিয়ারপুর (৮১.০)	মান্সা (৫২.৪)	হোশিয়ারপুর (৭৫.৩)	মান্সা (৪৫.২)
রাজস্থান	কোটা (৭৩.৫)	বাঁসওয়াড়া (৪৪.০)	কোটা (৬০.৪)	ঝালওয়ার (২৮.৮)

*	%		%	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
সিকিম	পূর্ব সিকিম (৭৪.৭)	পশ্চিম সিকিম (৫৮.৮)	পূর্ব সিকিম (৬৬.৮)	পশ্চিম সিকিম (৫০.১)
তামিলনাড়ু	কন্যাকুমারী (৮৭.৬)	ধর্মপুরি (৬১.৪)	কন্যাকুমারী (৮৪.৮)	ধর্মপুরি (৫০.৭)
ত্রিপুরা	পশ্চিম ত্রিপুরা (৭৭.৩)	ধলাই (৬০.৯)	পশ্চিম ত্রিপুরা (৬৯.৬)	ধলাই (৫১.০)
উত্তরপ্রদেশ	কানপুর নগর (৭৪.৫)	শ্রাবস্তী (৩৩.৮)	কানপুর নগর (৬৭.৫)	শ্রাবস্তী (১৮.৬)
উত্তরখণ্ড	দেরাদুন (৭৯.০)	হরিদ্বার (৬৩.৭)	দেরাদুন (৭১.২)	টিহরি গাড়োয়াল (৪৯.৪)
পশ্চিমবঙ্গা	কোলকাতা (৮০.৯)	উত্তর দিনাজপুর (৪৭.৯)	কোলকাতা (৭৭.৩)	উত্তর দিনাজপুর (৩৬.৪)

* ইংরেজি বর্ণমালা অনুযায়ী। মণিপুর সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়নি।

Source : Elementary Education in India : Where do we stand? Arun C. Mehta (Ed.), NIEPA, New Delhi (2006).

এখানে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, যে অঞ্চলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত, সেই অঞ্চলগুলিতে নারীরা সাক্ষরতার ক্ষেত্রে পুরুষদের অনেকটা কাছাকাছি আছে। সাক্ষরতার প্রসঙ্গো বর্তমানে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, উপজাতি জনগোষ্ঠী সুলভ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে আশা করা যায় নারীদের পিছিয়ে থাকার প্রকৃত কারণগুলির উপর আলোকপাত হবে। একমাত্র তখনই সম্ভব হবে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের শিক্ষা।

(Objectives) :

এই একক থেকে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন

- নারীদের সাক্ষরতার বর্তমান অবস্থা।
- নারী শিক্ষার সঙ্গো জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিভাবে সম্পর্কিত।
- UNESCO-র দলিলগুলিতে নারী শিক্ষা নিয়ে কি বলা হয়েছে।

(Present State of Women's Literacy in India) :

৫.১ নং সারণি দেখুন।

(Women's Education and Population Growth) :

একটি জাতির অগ্রগতির মাপকাঠি হল তার প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং সেখানকার মানুষের জীবনযাপনের গুণগত মান দেখে। জীবনের গুণগত মান উন্নত করার একটি পদ্ধতি হল সেই দেশের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা। শিক্ষার মাধ্যমে আনা যায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি। শিক্ষা আনে সচেতনতা এবং উদ্যোগ।

জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতা অপরিসীম। সংসারের সে একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তার সচেতনতার ওপর নির্ভর করে সংসারের সদস্যদের স্বাস্থ্য, পরবর্তী প্রজন্মের প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, বিবাহের বয়স এবং সামাজিক মর্যাদা।

শিক্ষার সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্কের ওপর নানা গবেষণা হয়েছে। তার থেকে দেখা গেছে, যে সমাজে শিক্ষার হার যত বেশি সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তত কম। এটি আরো বেশি দেখা গেছে যে শিক্ষিত নারীর হার যত বেড়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তত কমেছে। এর পেছনে অনেক কারণ পাওয়া গেছে। যেমন—

১। (ক) নারী সাক্ষরতা বৃদ্ধি পেলে, তাদের বিবাহের বয়সও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ বাল্যবিবাহ হ্রাস পায়।

(খ) এর ফলে শিশু মৃত্যুর হার কমে। যার দরুন বেশি সংখ্যক সন্তান উৎপাদনের প্রবণতা কমে।

(গ) ফলত সন্তান সংখ্যাও কমে।

২। শিক্ষা নারীকে তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে।

৩। শিক্ষা নারীকে স্বরোজগারের পথ দেখিয়েছে।

৪। শিক্ষা এবং রোজগার নারীকে তার সংসারে মর্যাদা এনে দিয়েছে এবং সংসারের হাল ফেরাতেও সাহায্য করেছে।

৫। শিক্ষা নারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে সামাজিক পরিবর্তন খোলা মনে গ্রহণ করতে সাহায্য করে এবং এর মাধ্যমে সমস্ত রকম দায়িত্ব পালনে নারী সক্ষম হয়।

(UNESCO Documents) :

১৯৪৬ সালে UNESCO-র জন্মলগ্ন থেকেই সাক্ষরতা প্রসারের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে।

সাক্ষরতার মাধ্যমেই আসে ব্যক্তির শিক্ষা, আসে সামাজিক অংশগ্রহণ। United Nations Literacy Decade (২০০০-২০১২) দ্বারা সাক্ষরতার ওপর বিশেষ দৃষ্টি এবং যৌথ উদ্যোগের সৃষ্টি হয়েছে।

EFA. Global Monitoring Report ২০০২ এর তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে সাক্ষরতার হার ৭৯.৭%। সেখানে মেয়েরা ৭৪.২% এবং ছেলেরা ৮৫.২%। দেখা গেছে নানা জায়গায় শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বিভেদটা কমেছে। তবে দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকা সাহারা অঞ্চলে ১৯৯০ সালের তুলনায় নিরক্ষরতা বেড়েছে, কারণ জনসংখ্যা-বৃদ্ধির অনুপাত বেড়েছে বলে।

১৯৬৫ সালে তেহরানে World Congress Ministers of Education of Eradication of Illiteracy হয়েছিল। সেখানে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এবং ৮ই সেপ্টেম্বরকে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস এবং Experimental World Literacy Programme (EWLP) এর জন্ম দেওয়া হয়েছিল।

১৯৭৫ সালে, পেট্রোপলিস্ এর International Symposium for Literacy-র EWLP-র থেকে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছিল। শিক্ষা যে একটি মৌলিক মানব অধিকার তার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১৯৯০ সালকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বৎসর বলে ঘোষণা করেছিল UNESCO। সেই বছর (Jomtein) জমটিন-এ World Conference of Education of All (WCEFA) অর্থাৎ সর্বশিক্ষার ওপর বিশ্বসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল প্রাথমিক শিক্ষাদান শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। এর সাফল্যের জন্য প্রথাগত শিক্ষা এবং প্রথাবহির্ভূত (Non formal) শিক্ষার কথা বলা হয়।

১৯৯৭ সালে UNESCO জার্মানির হ্যামবুর্গে "বয়স্ক শিক্ষার ওপর পঞ্চম আন্তর্জাতিক সম্মেলন" (Fifth International Conference on Adult Education) করে আরো ১৩টি সংস্থাকে নিয়ে। এখানে NGO বা বেসরকারি উদ্যোগের সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষাকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে "মৌলিক মানব অধিকার" এবং "দক্ষতা" যা মানুষকে অন্য দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করবে এবং নিজেকে এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে এই বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০০০ সালে সেনেগলের ডাকার-এ যে বিশ্ব শিক্ষা গোষ্ঠী (World Education Forum) হয়েছিল তাতে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন করা হয়েছিল। সেখান থেকে দেখা গিয়েছিল যে পূর্ববর্তী ১০ বছরে সাক্ষরতার হার ৭৪% থেকে বেড়ে ৮০% হয়েছে। কিন্তু সাক্ষর বয়স্ক মানুষের সংখ্যা প্রায় বাড়েনি। তাই ডাকার-এ ২০১৫ সালের মধ্যে সবাইকে সাক্ষর করে তোলার পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়। নারী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাদের ২নং লক্ষ্যে বলা হয়েছিল যে ২০১৫ মধ্যে সবাইকে, বিশেষ করে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে। তাদের ৫নং লক্ষ্যে বলা হয়েছে যে ২০০৫-এর ভেতর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে হবে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে লিঙ্গ ভেদ পুরোপুরি নির্মূল করতে হবে।

ডাকার-এর সম্মেলনে UNESCO-র সঙ্গে UNGEI (United Nations Girls' Education Initiative) এর যৌথ উদ্যোগ আরম্ভ হয়। এদের উদ্দেশ্য ২নং লক্ষ্য ও ৫নং লক্ষ্যকে সফল করা।

২০০২ সালে UNESCO ব্যাংককে একটি এশীয় মহাদেশে শিক্ষায় লিঙ্গ বিষয় আঞ্চলিক যোগাযোগ সংস্থা স্থাপন করে, যার নামকরণ হয় GENIA (Gender in Education Network in Asia)। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে যেমন সুযোগ, স্থায়ীকরণ, অংশগ্রহণ এবং আত্মসচেতনতা ইত্যাদিকে উৎসাহিত করা। ১৫টি দেশ এর সদস্য। ৯টি দেশ UNESCO-র থেকে বিশেষ সাহায্য পাচ্ছে মেয়েদের শিক্ষার উন্নতি করতে।

মেয়েদের অশিক্ষার একটি মূল কারণ দারিদ্র। বেশ কিছু রোজগার যোজনা চালু করা হয়েছে যাতে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তারা রোজগার করতে পারে। আফ্রিকার এই রকম দুটি কাজে UNESCO তাদের সাহায্য দিচ্ছে।

অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে বৈষম্য বেশি মাত্রায় আছে বলে UNESCO তাদের সাহায্যের হাত সেদিকেই বেশি বাড়িয়ে দিচ্ছে। সবাইকে সাক্ষর করতে গেলে সমাজে মেয়েদের সাক্ষর করাটা বেশি প্রয়োজনীয় বলে লক্ষিত হচ্ছে।

(Summary) :

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনতে গেলে সে দেশের নাগরিকদের নানা কর্মে পারদর্শী করার প্রয়োজন। পারদর্শিতা অর্জন করতে গেলে শিক্ষার প্রয়োজন। সমাজকে শিক্ষিত করতে গেলে নারীদের শিক্ষিত করা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষিত নারী সমাজ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। UNESCO তাদের শিক্ষার ওপর বিভিন্ন দলিলগুলিতে একথা নানা ভাবে স্বীকার করেছে। সবার জন্য শিক্ষার কথা বলার সময় তারা নারী শিক্ষার কথা আলাদা ভাবে উল্লেখ করেছে। নারী যে সমাজে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ভাবে অনুন্নত সমাজে অবহেলিত এবং অবদমিত সে কথা তারা স্বীকার করেছে। এটা মাথায় রেখেই UNESCO তাদের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে নারী শিক্ষাকে অর্থনৈতিক সহায়তা এবং অনেক সামাজিক সহায়তা দিয়ে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করেছে। শুধু সরকার একা যে এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, সেটা তারা বুঝেছে। তাই বেসরকারি (NGO) প্রতিষ্ঠানগুলিকেও তারা উৎসাহিত করতে চায় নারী শিক্ষা প্রসার করার জন্য। দারিদ্র যাতে নারী শিক্ষার পথে একটি প্রধান বাধা না হয়ে দাঁড়ায় সে জন্য তারা শিক্ষার সঙ্গে রোজগার যোজনার কথাও বলেছে।

(Exercise) :

●

১। UNESCO কবে স্থাপিত হয়?

২। কোন্ সালে জম্‌টিন (Jomtien) সম্মেলন হয়?

৩। ২০০০ সালে "বিশ্ব শিক্ষা গোষ্ঠী" কোথায় হয়েছিল?

৪। কোন্ সালকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বৎসর বলে ধরা হয়েছিল?

৫। ৮ই সেপ্টেম্বরের তাৎপর্য কী?

৬। কোন্ সালের ভিতর বিশ্ব থেকে নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে?

৭। E W L P-র পুরো নাম লিখুন।

৮। বয়স্ক শিক্ষার ওপর পঞ্চম আন্তর্জাতিক সম্মেলন কোথায় এবং কবে হয়েছিল?

৯। UNGEI এর অর্থ কী?

১০। GENIA বলতে কী বোঝেন?

●

১। নারী শিক্ষার সঙ্গে জনসংখ্যার কী সম্পর্ক সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২। ২০০০ সাল থেকে UNESCO-র দলিলগুলি নারী শিক্ষা সম্বন্ধে কী বলেছে?

●

১। কোনো জাতীয় উন্নয়নে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে UNESCO-র ভূমিকা আলোচনা করুন।

❑ (Policy Perspectives)

(Structure)

(Women's Studies Centres)

CABE

(Introduction) :

ভারতবর্ষের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীশিক্ষার অগ্রগতি বিশেষ হয়নি। বিশেষ করে স্বাধীনতার পূর্বে, মধ্যযুগীয় মানসিকতা ও কুসংস্কার বিভিন্নভাবে নারীশিক্ষার প্রগতিকে ব্যহত করেছে। স্বাধীন ভারতে অবশ্য অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীন ভারতে যে সংবিধান প্রবর্তিত হয় তা নারীশিক্ষার প্রসারে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এছাড়াও ভারত সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতি নির্দেশের মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষা প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ও নিয়ে চলেছে। এই এককে সরকারি প্রচেষ্টার একটি প্রাথমিক আলোচনা করা হবে। সরকারি সহায়তা ছাড়া নারীশিক্ষার প্রসার সম্ভব নয় এবং এ ব্যাপারে সরকারি প্রচেষ্টার বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

(Objectives) :

যে কোন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী ও পুরুষ দুই এর শিক্ষার দ্রুত বিকাশ ছাড়া দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ভারত সরকার বিশেষ নীতি ঘোষণা করেছিলেন যাতে নারীশিক্ষার দ্রুত প্রসার হতে পারে এই এককের পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থী যে সব বিষয় সম্বন্ধে অবগত হবেন তা হল—

- নারীশিক্ষার প্রগতির জন্য সাংবিধানিক নির্দেশগুলি কী কী,
- নারীশিক্ষার বিকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিবেদন কী,
- এ প্রসঙ্গো কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ভূমিকা কী প্রকার,
- ১৯৬৮ জাতীয় শিক্ষানীতিতে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য কী সুপারিশ করা হয়,
- ১৯৮৬ জাতীয় শিক্ষানীতিতে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য কী সুপারিশ করা হয়,
- ১৯৯২ এ প্রোগ্রাম অব এ্যাকশনে নারীশিক্ষার সম্বন্ধে কি নীতি নেওয়া হয়েছিল।

(Constitutional Provision and Women's Education) :

আমাদের সংবিধানের মুখবন্ধে যে নীতিগুলি ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যেই নারীপুরুষের সমানাধিকারের মনোভাব প্রছন্ন রয়েছে। সামাজিক ন্যায়বোধ, সমতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এই মূল্যবোধগুলি নারী প্রগতির ভিত্তি প্রস্তর। এছাড়া নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীশিক্ষা তথা নারীর সমান অধিকারের সঙ্গো জড়িত।

অনুচ্ছেদ 14 এতে বলা হয়েছে ভারতের মধ্যে আইনের চোখে সব ব্যক্তি সমান বলে পরিগণিত হবে। অনুচ্ছেদ ১৫-তে উল্লেখ করা হয়েছে ধর্ম, জাতি, কুল, লিঙ্গা অথবা বাসস্থানের ভিত্তিতে রাজ্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন বিভেদ করবে না এবং প্রয়োজন হলে সমানাধিকার বজায় রাখতে আইন প্রণয়ন করবে।

অনুচ্ছেদ 16 এর সাহায্যে রাষ্ট্রকে চাকুরীর ব্যাপারে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এখানেও ধর্ম, জাতি, লিঙ্গা বা বাসস্থান বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে চাকুরীতে অযোগ্য বা অনধিকারী বলা যাবেনা। কোন বর্গের নাগরিকদের উপস্থিতি যদি কোন ক্ষেত্রে কম থাকে, তাহলে প্রয়োজন বোধে সরকার এই ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

অনুচ্ছেদ 23 এর সাহায্যে মানবপণ্য ও বলপ্রয়োগ দ্বারা শ্রম প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ 39 এর মধ্যে সংবিধান রাষ্ট্রকে কতগুলি নির্দেশ দিয়েছে যেমন—পেশার ক্ষেত্রে নারীপুরুষের সমান অধিকার, নারীপুরুষ নির্বিশেষে একই কাজের জন্য একই বেতন, সকলের সমান ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুর সুষমবিকাশ, শোষণের থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি।

অনুচ্ছেদ 39A -তে সকলের জন্য সমবিচার ও প্রয়োজন হলে বিনা মাসুলে আইনী সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ 42 এ কর্মক্ষেত্রে মানবিক পরিস্থিতি ও গর্ভকালীন সময়ে অসুবিধা লাঘবের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে ও সেই অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সবশেষে অনুচ্ছেদ 325 ও 326-এ নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন নির্দেশের সাহায্যে নারী পুরুষের সমান অধিকারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

(Role of University Grants Commission) :

নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর বক্তব্য ও সুপারিগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ উচ্চ শিক্ষার মান নির্ধারণ ও উচ্চশিক্ষার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কমিশন শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্দেশ সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে থাকে।

কমিশন প্রথমেই এই বক্তব্য রাখে যে মহিলাদের সামাজিক অধিকার ও ন্যায় বিচার দেওয়ার জন্য মহিলা শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এই দুটি বিষয়কে একত্রিত করে দেখা দরকার। আশার কথা এই যে সরকারী নীতি ও পরিকল্পনায় মেয়েদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

UGC আরো মন্তব্য করে যে নারীশিক্ষার মন্থর অগ্রগতির অন্যতম কারণ হল শিক্ষামূলক পরিকাঠামোর অভাব। তাই কমিশন সুপারিশ করে যে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্যের দরকার। এ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি হল এই প্রকার —

- মহিলাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক প্রসার করতে হলে মহিলা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের জন্য শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে।
- এই ব্যাপারে যে সব ক্ষেত্রে অনুদান দেওয়া হবে তা হল :
  — মহিলাদের নিজস্ব কমন রুম
  — মহিলাদের পৃথক শৌচাগার
  — জিমন্যাসিয়াম এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা

(Women's Studies Centres)

১৯৮৬ এর সরকারি শিক্ষানীতিতে মহিলা শিক্ষা বিষয়ে কেন্দ্র (WSC) স্থাপনের উল্লেখ আছে। এই কেন্দ্রগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বিভাগ হিসাবে সংযোজিত করে নারী শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা ও উন্নয়ন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন এই কেন্দ্রগুলিকে বিশেষভাবে সাহায্য করে এবং মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রসারে এই কেন্দ্রগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই কেন্দ্রগুলির বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলি হল—

- নারীশিক্ষা ও মহিলা ক্ষমতায়ণের বিষয়ে গবেষণা
- নারীশিক্ষা পদ্ধতি ও শিখন সংক্রান্ত কার্যাবলী
- বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীশিক্ষার প্রসার

● এবং নারীশিক্ষার সমর্থনে বিভিন্ন ধরনের প্রচারমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করা।

WSC গুলি বিশেষভাবে নারীশিক্ষার কাজে ব্যাপৃত আছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৪টি কেন্দ্র বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত আছে। সাধারণভাবে এই কেন্দ্রগুলি মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করে। এই সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশ করে এবং নারীশিক্ষা সম্পর্কিত নীতি ও পরিকল্পনার বিশ্লেষণ করে থাকে।

(Role of Ministry of Human Resource Development) :

সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষা রাজ্যস্তরের বিষয়। পরে অবশ্য সংবিধান সংশোধন করে শিক্ষাকে Concurrent list এ আনা হয়। তাই সারা ভারতবর্ষের শিক্ষার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক সাধারণভাবে শিক্ষাপ্রসারের জন্য সর্বোচ্চ স্তরে (apex level) নীতি প্রণয়ন করে এবং সেই অনুযায়ী নির্দেশ দেয়। নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও সেই সিদ্ধান্তগুলির প্রয়োগ করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর সর্বদাই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রকদপ্তর যে সব পদক্ষেপগুলি নিয়ে থাকে তা হল—

- বিভিন্ন সময়ে নারীশিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্দেশের খসড়া তৈরি করার জন্য কমিটি ও কমিশন নিয়োগ করা।
- বিভিন্ন নারীশিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনায় আর্থিক অনুদান এর ব্যবস্থা করা।
- সারা দেশের নারীশিক্ষা প্রসারে কেন্দ্রীয় স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেই অনুযায়ী রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি।

:

১৯৬৭ সালে ভারতসরকার লোকসভার সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে এবং এই কমিটি শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি করে। এই খসড়া অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়।

১৯৬৮ সালের শিক্ষানীতিতে বলা হয় যে সমাজতান্ত্রিক দেশ তৈরি করতে হলে শিক্ষায় সমসুযোগ বৃদ্ধি করা একান্ত দরকার। দেশের অগ্রগতির জন্য দক্ষ ও চরিত্রবান নারী ও পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন এবং শিক্ষাই একমাত্র এই লক্ষ্য পুরণ করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষায় সমসুযোগের কথা বলতে গিয়ে ১৯৬৮-র শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয় যে মেয়েদের শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে কারণ শুধুমাত্র সামাজিক ন্যায়বিচার নয়, সমাজের আমূল পরিবর্তন আনতে হলে মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতি ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এই সঙ্গে অনুন্নত ও উপজাতি অঞ্চলের শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনের কথাও বলা হয়েছে বিশেষ করে যেখানে মহিলা নিরক্ষরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি।

:

১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতিতে মহিলাদের শিক্ষায় সমসুযোগের প্রসঙ্গো আবারও ঘোষণা করা হয় যে শিক্ষাই একমাত্র মহিলাদের সামাজিক পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা দিতে পারে। অতএব জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সাহায্যে এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যাতে মহিলাদের ক্ষমতায়ণ সম্ভব হবে। ১৯৮৬-র শিক্ষানীতিতে যে যে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় তা হল—

- পাঠক্রমে সূক্ষ্ম পরিবর্তনের দ্বারা নতুন আধুনিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা
- শিক্ষা গ্রন্থর মাধ্যমে মহিলাদের সামাজিক স্থান সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- শিক্ষকদের মধ্যে এই ব্যাপারে প্রশিক্ষণ ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জাগরণ
- প্রশাসক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের মানসিকতার পরিবর্তন আনয়ন

এই ধরনের পদক্ষেপগুলিকে সামাজিক উন্নয়ন বা Social Engineering বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ, শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রশাসক সবার মধ্যে মহিলাদের সম্বন্ধে নতুন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ। ১৯৮৬ এর শিক্ষানীতিতে যে আরও কয়েকটি শিক্ষানীতির ঘোষণা করা হয়েছিল তা হল—

- মেয়েদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি যাতে এগুলি শিক্ষার্থীকে ধরে রাখতে পারে যতক্ষণ না প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় (Retention)।
- এর জন্য যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার তা হল আনুষঙ্গিক পরিষেবার উপর (Support Services) যেমন ECCE (Early childhood care and education), পানীয়জল, পশুখাদ্য ইত্যাদির সহজলভ্যতা।
- এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বা আধুনিক পেশায় মহিলারা যাতে প্রবেশাধিকার পায় সেদিকেও সতর্ক নজর রাখা হবে।

(Programme of Action)

১৯৮৬ এর শিক্ষানীতির সঙ্গো জড়িত প্রোগ্রাম অফ্ এ্যাকশনে যে সব কর্মকৌশল নেওয়া হয় সেগুলি হল—

- মহিলা ক্ষমতায়ণ—মহিলা ক্ষমতায়ণের সূচকগুলি হল মহিলাদের নিজেদের সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও ধনাত্মক মনোভাব গঠন, দলবদ্ধ ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখা ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তটি কাজে পরিণত করার মত ক্ষমতা অর্জন, সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য পুরুষদের সাথে সমভূমিকা পালন এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাহায্য করা।
- ১৯৯৫ এর মধ্যে প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহিলাদের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন ধরনের সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করবে ও মহিলাদের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হবে।

- প্রতিটি শিক্ষক ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের মহিলা ক্ষমতায়ণ বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হবে। এই ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলি তৈরি করবে NCERT ও NIEPA, SCERT বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের আধিকারিক। ঐ ব্যাপারে UGC-ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।
- মহিলা শিক্ষক ও বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্রের মহিলা প্রশিক্ষকদের এই বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হবে যাতে তাঁরা নারীপুরুষের সমতা আনতে সাহায্য করতে পারে।
- আলোচনা, পথসভা, নাটক, পুতুল নাচ ইত্যাদির সাহায্যে মহিলাদের সম্বন্ধে ধনাত্মক মনোভাব ও সচেতনতা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হবে।
- নারী সচেতনতা বৃদ্ধি ও মেয়েদের সম্বন্ধে ধনাত্মক ধারণা গড়ে তোলার জন্য গণমাধ্যম যেমন দূরদর্শন ও বেতারকে কাজে লাগাতে হবে।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- NCERT -র যে উইমেনস্ Cell আছে সেটির সাহায্যে পাঠক্রমের প্রধান অংশের মধ্যে এমন বিষয় আনতে হবে যা মহিলা পুরষের সমতা ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। এই Cell এর সাহায্যে পাঠ্যবই-এ মহিলাদের সম্বন্ধে যে একপেশে প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা আছে তা দূর করতে হবে।
- NIEPA (National Institute for Educational Planning and Administration) এই ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং তা বাস্তবে রূপায়ণ করবে।

১৯৮৬ এর শিক্ষানীতি ও প্রোগ্রাম অফ্ এ্যাকশনের সংশোধন করার জন্য ১৯৯০-এ রামমূর্তি রিভিউ কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটি ১৯৮৬ এর শিক্ষানীতির পরিমার্জন করে যে সব সুপারিশগুলি করে তা হল বাসস্থানের নিকটে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মেয়েদের কাছে বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তোলা, আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার, উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের সুযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

CABE :

১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতি, প্রোগ্রাম অফ্ এ্যাকশন, ও রামমূর্তি রিভিউ কমিটির মতামত বিবেচনা করার জন্য ১৯৯২ এ CABLE কমিটি একটি রিপোর্ট পেশ করে। মহিলা শিক্ষার প্রসারের বিষয়ে এই কমিটির সুপারিশগুলি হল নিম্নরূপ—

- ১৯৯০ এর রিভিউ কমিটির মতামতকে সমর্থন করে বলা হয় যে মহিলা শিক্ষার প্রসারের সাথে অন্যান্য পরিষেবা ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। এর জন্য শিক্ষা বিভাগ অন্যান্য বিভাগের সাথে সহযোগিতা করবে যাতে মহিলাদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে প্ল্যানিং কমিশন ও মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক দপ্তরকে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে।
- ১৯৯০ যে মহিলা সমক্ষ গঠন করার কথা হয়েছিল সেই কর্মসূচিটিও সমর্থন করা হয়।

- নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য শুধুমাত্র প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিশিক্ষার ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে তা নয়, এ ছাড়াও Special Component Plan-এর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তপশিলি মহিলাদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

(Summary) :

এই এককে প্রধানতঃ মহিলা শিক্ষার প্রসারে সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা আলোচনা করা হয়েছে। নারীশিক্ষার প্রসারের যে সব নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার ভিত্তি প্রস্তর হল ভারতের সংবিধান। এই এককে সংবিধানের নির্দেশগুলি আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়াও সরকারি শিক্ষা নীতির আলোচনা ১৯৬৮ ও ১৯৮৬-র শিক্ষানীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে তাও বর্ণনা করা হয়েছে। এই এককটির মধ্যে দিয়ে সরকারি শিক্ষানীতি কিভাবে মহিলাশিক্ষার প্রসারে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে ও করছে সে সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

(Exercise) :

-

১। মহিলা শিক্ষা বিস্তারে সংবিধানের একটি অনুচ্ছেদের উল্লেখ করুন।

২। মহিলাদের উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য UCG এর দুটি সুপারিশ কি কি?

৩। উইমেন্স স্টাডিজ সেন্টারের দুটি উদ্দেশ্য লিখুন।

৪। ১৯৮৬ এর প্রোগ্রাম অফ্ এ্যাকশনের দুটি সুপারিশ লিখুন।

-

১। নারী ক্ষমতায়ণ বলতে কি বোঝেন?

২। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ভূমিকা কি?

৩। ১৯৬৮-এর শিক্ষানীতিতে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে?

৪। নারীশিক্ষার প্রসারে UGC এর সুপারিশগুলি কি কি?

-

১। নারীশিক্ষার প্রসারে ভারত সরকারের শিক্ষানীতির আলোচনা করুন।

২। নারী ক্ষমতায়ণ বলতে কি বোঝেন? কিভাবে নারী ক্ষমতায়ণ বাস্তবায়িত করা সম্ভব? এ ব্যাপারে শিক্ষার ভূমিকা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।

❑

(Committees and Commissions on Women's Education)

(Structure)

(Introduction) :

সরকারি শিক্ষানীতি নির্ধারণে কমিটি কমিশনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারকে কোন বিশেষ বিষয়ে পরামর্শ দিতেই এই কমিটিগুলি গঠিত হয়। নারীশিক্ষার অগ্রগতির পথে বাধা কোথায় এবং কিভাবে এই শিক্ষার গতি ত্বরান্বিত করা যায় তা জানার জন্য এই কমিটি ও কমিশনের সুচিন্তিত মহামতগুলি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন। এ ছাড়াও এই কমিশন, কমিটিগুলির সুপারিশ কতখানি সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করেছে এবং সেই অনুযায়ী সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছে এ সম্বন্ধে ধারণা থাকার জন্য এই রিপোর্টগুলির বিষয়বস্তু জানার প্রয়োজন আছে।

(Objectives) :

বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির মাধ্যমে সরকার দেশের শিক্ষাবিদ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে মহিলা শিক্ষা সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত চেয়ে থাকেন, যার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় সরকারি নীতিতে। তাই এই এককের বিষয়বস্তু পড়ার পর শিত্রার্থীরা যে সব বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারবেন তা হল—

- নারীশিক্ষা প্রসঙ্গো রাধাকৃয়ন কমিশনের সুপারিশগুলি কি ছিল,
- মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন অর্থাৎ মুদালিয়ার কমিশন এই প্রসঙ্গো কি সুপারিশ করেছিল,
- ভারতীয় শিক্ষাকমিশন অর্থাৎ কোঠারী কমিশন নারীশিক্ষা বিষয়ে কি কি বক্তব্য রেখেছে,
- মূলতঃ নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত দুর্গাবাই দেশমুখ কমিটির সুপারিশগুলি কি কি,
- ছেলে মেয়েদের পাঠক্রম বিষয়ে হংস মেহতা কমিটির বক্তব্য কি ছিল,
- মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে জনসমর্থনের অভাবের বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য ভক্তবৎসলম কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে জানা যাবে।

(Recommendation of Radhakrishnan Commission on Women's Education) :

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই সরকার যে প্রথম কমিশনটি স্থাপন করেন তা হল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বা রাধাকৃয়ন কমিশন (১৯৪৮-৪৯)। কমিশনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সম্বন্ধে সুপারিশ দেওয়া। নারীশিক্ষার ব্যাপারেও এই কমিশনের মতামত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ প্রসঙ্গো কমিশন প্রথমেই উল্লেখ করে যে "There can not be educated people without educated women. If general education to be limited to men or to women, the opportunity should be given to women for then it would most surely be passed on to the next generation." তবে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে কমিশন মনে করেছিল যে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির অবশ্যই প্রয়োজন আছে তবে নারীশিক্ষা ও পুরুষের শিক্ষা একই ধরনের হওয়ার যুক্তি নেই। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে কমিশনের সুপারিশগুলি এই প্রকার—

- যে কলেজগুলিতে ছাত্রদের সংখ্যা বেশি সেগুলিতে এখন অধিক সংখ্যায় মেয়েরা ভর্তি হচ্ছে, অতএব এই সব কলেজগুলিতে নারীশিক্ষার জন্য সব রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- শিক্ষার সুযোগ থেকে মেয়েরা যেন কোনরকমভাবেই বঞ্চিত না হন বরং এই সুযোগ কি ভাবে বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।
- শিক্ষার ব্যাপারে মহিলারা পুরুষদের অনুকরণ করুক এটা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই মহিরাদের কি ধরনের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ এবং সেই অনুযায়ী মহিলারা যাতে শিক্ষা পেতে পারে তার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পরামর্শদাতা নিয়োগ করা দরকার। মহিলা ও পুরুষের শিক্ষা অনেক ব্যাপারে এক ধরনের হলেও একেবারে অভিন্নরূপে গণ্য করা ঠিক হবে না।

- সমাজে মহিলারা শুধুমাত্র নাগরিক নন তার সাথে মহিলার যে বিশেষ ভূমিকা তা পালন করতে শেখানোর জন্য কলেজের কর্মসূচী সেই ভাবে সংগঠিত করতে হবে।
- গার্হস্থ্য শিক্ষা বা গার্হস্থ্য অর্থনীতির বিরুদ্ধে যে ধরনের সংস্কার আছে তা কাটিয়ে ওঠা দরকার।
- সহশিক্ষা যেখানে দেওয়া হয় এই ধরনের কলেজে পুরুষদের সামাজিক দায়িত্ব ও মহিলাদের সম্মান রক্ষার ব্যাপারে সচেতন করবার চেষ্টা করা দরকার।
- নতুন কলেজ, যেখানে সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, সেই সব কলেজে মেয়েদের প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
- মহিলা শিক্ষিকারা পুরুষ শিক্ষকের সাথে সমহারে বেতন পাবেন।
- রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ১৩ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করার সুপারিশ। যদিও কলেজ স্তরে সহশিক্ষা ব্যবস্থাকে সমর্থন করা হয় তবুও কিশোর বয়সের জন্য কমিশন ছেলে মেয়েদের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে মত পোষণ করে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা অহেতুক অধিক অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে এবং এতে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগের অভাব দেখা যেতে পারে। তাই কমিশন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সহশিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিল।

(Secondary Education Commission, 1952-53, Mudalias Commission and Women's Education) :

এই কমিশনের চতুর্থ অধ্যায়ে মহিলা শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে কিছু বলা হয়। মহিলা শিক্ষা প্রসঙ্গো কোন রকম আলাদা অধ্যায় রিপোর্টে নেই। কমিশন মন্তব্য করে যে ঐ সময়ে সমাজে যে বৈপ্লপিক পরিবর্তন এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা—এই মতবাদের কোন যুক্তি নেই। সমস্ত ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই পুরুষ ও মহিলা দুজনের কাছেই উন্মুক্ত। কমিশন আরও মন্তব্য করে যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে দেখা গেছে যে মেয়েরা ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, চিকিৎসা, পশুচিকিৎসা, বাণিজ্য, আইন, শিক্ষকতা ইত্যাদি বৃত্তিতে নিযুক্ত হচ্ছে ও পড়াশোনা করছে।

তবে মহিলাদের শিক্ষা নিয়ে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে কিছু দ্বিমত দেখা যায়। একদিকে ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষার পার্থক্য থাকবে এবং মেয়েরা প্রধানতঃ গৃহস্থালীর কাজের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে। অন্যদিকের মত হল মহিলারা গৃহের চার দেওয়ালের বাইরে এসে সমাজে নিজস্ব স্থান গ্রহণ করতে শিখবে। অতএব পুরুষ ও নারীর শিক্ষার জন্য কোন পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

অবশ্য একথাও স্বীকার করা হয় যে ধরনের শিক্ষাই হোক না কেন গৃহ ও সামাজিক গোষ্ঠীর সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক থাকা দরকার। শিক্ষা এমন হবে যেখানে ব্যক্তি ভবিষ্যতের সুনাগরিক হওয়ার সাথে

সাথে তার পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতেও সক্ষম হবে। তাই মেয়েদের শিক্ষা প্রসঙ্গে শিক্ষার দ্বৈত উদ্দেশ্য অর্থাৎ পরিবার ও সমাজের বিকাশের শিক্ষা দুই এর উপরই জোর দেওয়া উচিত। শিক্ষা শুধু গৃহস্থালী বা সংসারের কাজের জন্য নয় বরং সামাজিক উন্নয়নের জন্যও এর ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন।

(Recommendations on Co-education)

সহশিক্ষার ব্যাপারে কমিশন মন্তব্য করে যে প্রাথমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সাধারণত দেখা গেছে যে সহশিক্ষা ব্যবস্থার সমর্থন আছে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে এই ব্যাপারে দ্বিমত দেখা গেছে। অনেকেই মনে করেন যে কিশোর বয়সের সময়ে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকাই ভালো। অন্যদিকে পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা আবার খরচ সাপেক্ষ। তাছাড়া অর্থনৈতিক অসুবিধার জন্য হয়ত যথেষ্ট মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যাবে না এবং মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাবে না।

কমিশন এ প্রসঙ্গে এই সুপারিশ করেন যে যদি সম্ভব হয় তাহলে মেয়েদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত। কারণ মিশ্র প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এখানে মেয়েরা অবশ্য অনেক বেশি সুযোগ পাবে এবং রাজ্য এই ধরনের প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সংখ্যায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে।

তবে অভিভাবকের আপত্তি না থাকলে মিশ্র প্রতিষ্ঠান বা ছেলেদের স্কুলেও মেয়েদের ভর্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত।

কমিশন উল্লেখ করে যে অনেক সময় ছেলেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সরঞ্জাম ও গৃহ নির্মাণ বাবদ তুলনামূলকভাবে বেশি সরকারি অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। তাই মুদালিয়ার কমিশন সুপারিশ করে যে ভবিষ্যতে মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সরকার একইভাবে অর্থ সাহায্য করবে, যাতে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের বৌদ্ধিক বিকাশে যেন কোন রকম তারতম্য না হয়।

মিশ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসঙ্গে মুদালিয়ার কমিশন বলে যে এই ধরনের বিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিতে হবে। এর জন্য কিছু নিয়ম প্রবর্তন করাও দরকার। যেমন—

- বিদ্যালয়ের কর্মীদের মধ্যে মহিলা ও পুরুষ দুই ধরনের কর্মীই থাকবেন।
- মেয়েদের কাছে আকর্ষণীয় বিষয় যেমন গার্হস্থ্য বিদ্যা, সঙ্গীত, অঙ্কন ও মুদ্রণশিল্প ইত্যাদির পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- এছাড়া মেয়েদের জন্য পৃথক খেলার মাঠ, কমন রুম ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
- যেখানে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম যেমন গ্রাম অঞ্চলে, সেখানেও অন্তত একজন মহিলা শিক্ষিকা থাকবেন। শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকা দরকার।
- সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে মেয়েদের জন্য গাইড, নার্সিং ও সেলাই এই ধরনের সহপাঠক্রমিক কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যাপারেও মহিলারা যাতে অংশ নিতে পারে তার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

(Indian Education Commission, 1964-66, Kothari Commission and Women's Education) :

শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই নারীশিক্ষা সংক্রান্ত তিনটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এগুলির সম্পর্কে এই এককেই আলোচনা করা হবে। এই তিনটি কমিটি হল—

- শ্রীমতি দুর্গাবাই দেশমুখ কমিটি (মহিলা শিক্ষা জাতীয় কমিটি)
- শ্রীমতি হংস মেহেতা কমিটি (পাঠক্রমের পৃথকীকরণ কমিটি)
- শ্রী ভক্তবৎসলম কমিটি (৬টি রাজ্যে নারী শিক্ষার সমস্যা সংক্রান্ত কমিটি)

শিক্ষা কমিশন অর্থাৎ কোঠারী কমিশন এই তিনটি কমিটির প্রতিবেদনগুলি পুরোপুরি সমর্থন করে। কোঠারী কমিশন মন্তব্য করে যে গৃহ ও সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও আধুনিক যুগে মহিলাদের ভূমিকা আরও ব্যাপক। সামাজিক বিকাশে পুরুষের সাথে মহিলার দায়িত্বও সমান। স্বাধীনতার আগে পুরুষ ও মহিলা একত্রে মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল এবং আজও দেশের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অপুষ্টির সংগ্রামে এই যৌথ প্রচেষ্টা বজায় থাকা একান্ত দরকার।

কমিশন আরও বলে যে—

- নারীশিক্ষা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিশেষ কার্যসূচী বলে পরিগণিত হয়। এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রচেষ্ট হয়ে যতদুর সম্ভব কম সময়ের মধ্যে নারীশিক্ষার অসুবিধা দূর করতে হবে ও নারীপুরুষের শিক্ষার তারতম্য কমিয়ে ফেলতে হবে।
- এর জন্য বিশেষ কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নারীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রস্তরে বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এরজন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি আধিকারিকদের একসাথে কাজ করতে হবে।
- যেহেতু গৃহের বাইরেও মহিলাদের একটি আলাদা জীবন আছে তাই মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও আংশিক ও পূর্ণ সময়ের চাকুরীর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীর সাথে সাথে যে সব মহিলার সন্তান বড় হয়ে গেছে ও যাদের হাতে সময় আছে, তাদের জন্য চাকুরীর সুযোগ করে দিতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সংবিধানের প্রস্তাব মত যত শীঘ্র সম্ভব সার্বজনীন শিক্ষা চালু করতে হবে।
- মাধ্যমিক স্তরে আগামী ২০ বছরের মধ্যে ছেলে ও মেয়েদের অনুপাত ২ : ১ এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৩ : ১ করতে হবে। এছাড়া মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয়, বৃত্তির ব্যবস্থা, আংশিক পাঠক্রম ও বৃত্তিমূলক পাঠক্রম ও ছাত্রী আবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

- হংস মেহতা কমিটির সুপারিশ মত ছেলে ও মেয়েদের পাঠক্রম আলাদা হওয়া উচিত নয় এবং গৃহবিজ্ঞান বিষয়টি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখা উচিত এবং মেয়েদের জন্য এটি আবশ্যিক হবে এমন কোন কথা নেই। অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া দরকার।
- কমিশন মন্তব্য করে যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত ৪ : ১ এবং এই অনুপাতকে ৩ : ১ করা প্রয়োজন যাতে বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষিত মহিলাদের নিয়োগ করা যায়। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয় স্নাতক স্তরে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা দরকার তবে স্নাতকোত্তর স্তরে এই ধরনের পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। পাঠক্রম প্রসঙ্গে বলা হয় যে বিভিন্ন বিষয় যেমন কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ মেয়েদের থাকবে। গৃহবিজ্ঞান, নার্সিং ও সমাজসেবা মূলক কাজ, যেগুলি মেয়েদের কাছে আকর্ষণীয়, সেগুলির বিকাশ সাধন করা প্রয়োজন। মহিলা শিক্ষার্থীদের বাণিজ্য প্রশাসনের মত বিষয় শেখার প্রশিক্ষণও দেওয়া উচিত এবং সবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে নারীশিক্ষার ব্যাপারে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।
- শিক্ষিকা নিয়োগের প্রসঙ্গেও কমিশন কিছু প্রতিবেদন রাখে। যেমন,

  শিক্ষার সবক্ষেত্রে শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারে মহিলাদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারেও সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

  গ্রাম অঞ্চলে মহিলা শিক্ষিকাদের থাকার জন্য কোয়াটার্সের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন হলে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিকাদের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। শিখন পদ্ধতির উন্নতির জন্য মহিলাদের জন্য ডাকযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

(National Committee on Women's Education 1958-59, Durgabai Deshmukh Committee) :

১৯৫৭ সালের প্ল্যানিং কমিশনের এডুকেশন প্যানেল এর একটি মিটিং-এ নারীশিক্ষার সম্বন্ধে আলোকপাত করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করার প্রস্তাব করা হয় এবং এই প্রস্তাবমত ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক এই কমিটি স্থাপন করে। কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা হয় শ্রীমতি দুর্গাবাই দেশমুখকে।

(Objectives of the Committee)

কমিটির উদ্দেশ্যগুলি ছিল নিম্নপ্রকার—

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া
- মহিলা শিক্ষার সর্বস্তরে যে অপচয় আছে তার অনুসন্ধান করা।
- মহিলারা বিশেষ করে নিরক্ষর মহিলারা কিভাবে শিক্ষার সাহায্যে নিজেদের রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে ও সামাজিক অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই সংক্রান্ত ব্যবস্থা করা।

- যে সব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নারী শিক্ষায় নিযুক্ত আছে তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত সংঞ্জাম ঠিকমত আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা এবং প্রয়োজনমত এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করা।
- কিভাবে মহিলাদের বৃত্তি শিক্ষায় উৎসাহিত করা যায় সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা।

(Various Recommendations of the Committee)

এই কমিটি প্রথমে কয়েকটি বিশেষ সুপারিশ করে, যেগুলিকে মহিলা শিক্ষার প্রসারের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়। এগুলি হল—

- নারী ও পুরুষের শিক্ষার মানের যে পার্থক্য আছে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করা এবং প্রয়োজন মত এই ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ করা দরকার।
- নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নারীশিক্ষা পর্ষদ গঠন করা (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশন অফ্ গার্লস এন্ড উইমেন) রাজ্য সরকারগুলিও এব্যাপারে রাজ্য স্তরে কাউন্সিল গঠন করবে।
- প্রতিটি রাজ্য নারীশিক্ষার বিস্তারের জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।
- নারীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় শাসক গোষ্ঠী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, শিক্ষক সংসদ ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য নেওয়া দরকার।
- কি ধরনের মহিলা কর্মীর প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করার জন্য প্ল্যানিং কমিশনের একটি পূর্ণসময়ের বিভাগ তৈরি করতে হবে।

কমিটি মেয়েদের শিক্ষার প্রসারের জন্য আরো কয়েকটি সুপারিশ করেছিল, যেগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

- প্রাথমিক শিক্ষা (৬-১১ বৎসর)

  প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার মেয়েদের বিশেষ বিশেষ সুবিধা দেবেন যাতে তারা শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী হয়। বিশেষ করে গ্রামে যেখানে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার কম সেখানে বৃত্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা করা দরকার।
- মাধ্যমিক শিক্ষা (১১-১৭ বৎসর)

  শিক্ষার এই স্তরে আরও সহশিক্ষা দেওয়া হয় এই ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। কিন্তু গ্রামে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা বিদ্যালয় থাকাই বাঞ্ছনীয় কিন্তু অভিভাবকরা যদি তাদের কন্যাসন্তানকে ছেলেদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে চায় তাহলে সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের দেওয়া হবে। যে সব অভিভাবকের বেতন ন্যূনতম সীমার নীচে তাদের মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক হবে। যতদূর সম্ভব মিডল স্কুল ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকবে।

পাঠক্রম সংক্রান্ত সুপারিশ —প্রাথমিক স্তরে ছেলে ও মেয়েদের পাঠক্রম একই হবে যদিও সঙ্গীত, কলা ও সেলাই শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। মিডল স্তরে অর্থাৎ নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়েদের পাঠক্রম পৃথক করার প্রয়োজন আছে।

মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করার দরকার এবং গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিকাদের চাকুরীতে নিয়োগ করতে হলে হস্টেল বা কোয়াটার্সের ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষিকাদের অবসরের বয়স হ্রাস করা উচিত এবং নিয়োগ করার সময়ও বয়সের উর্ধ্বসীমা শিথিল করতে হবে যাতে বেশি সংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয়।

বৃত্তি ও পেশাগত শিক্ষার ব্যাপারে কমিটি মন্তব্য করে যে বাণিজ্য, কৃষি, চিকিৎসা, ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি পেশায় যাতে মহিলারা বেশি সংখ্যায় আসতে পারে তার জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন হলে মেয়েদের আংশিক সময়ের জন্য বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত করা দরকার। বৃত্তি শিক্ষায় মহিলাদের নিয়োগের প্রয়োজনের ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলার দরকার।

বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষার জন্য কমিটি সুপারিশ করে যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও স্বল্পকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। কমিটি মনে করে যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে মহিলা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অর্থাৎ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষার প্রসারে বেশি করে কাজে লাগানো যেতে পারে।

অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে কমিটি মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় ও অনুন্নয়ন (Wastage and Stagnation) এর বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এর কারণ হিসাবে পিতা মাতার উদাসীনতা এবং অর্থনৈতিক দুরাবস্থাকে দায়ী করা যায়। কমিটি এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছিল।

- প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং ৬০ দিনের পরে আর ভর্তি হবে না।
- শিক্ষিকারা বিশেষ করে দেখবেন যাতে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বজায় থাকে।
- শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে হবে এবং ভর্তির বয়স ৬+ করা দরকার।
- অনুন্নয়ন রোধ করার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা নিতে হবে, শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি করতে হবে এবং গরীব মেয়েদের জন্য বই ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- যারা কোন রকম অর্থনৈতিক কাজে নিযুক্ত আছে তাদের জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পিতামাতার উদাসীনতা দূর করার জন্য প্রচার অভিযানের ব্যবস্থা করতে হবে।

সবশেষে শিক্ষকদের বেতনের মানের কথাও বলা হয়। বেতনের স্কেলের সংশোধন করা প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের বেতন কাঠামো এক হতে হবে এবং অরসরকালীন ভাতা (pension), প্রভিডেন্ড ফান্ড ও জীবন বীমার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

(Hansa Mehta Committee (1961) Committee on Differentation of Curricula for Boys and Girls) :

১৯৬১ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর উইমেনস এডুকেশন এর নির্দেশে ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের পরামর্শ ক্রমে হংস মেহতার সভাপতিত্বে এই কমিটি গঠিত হয়।

(Objectives of the Committee)

কমিটি যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল তা হল নিম্নরূপ—

- মহিলাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পূরণে বর্তমান পাঠক্রম কতখানি কার্যকরী এবং বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই ব্যাপারে পরিবর্তন আনা।
- গার্হস্থ্যবিদ্যা ও কলা বিদ্যা ছাড়াও মেয়েদের শিক্ষার পাঠক্রমে বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে অন্যবৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা।
- কলা শিক্ষা ও গার্হস্থ্য শিক্ষার পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে এগুলো বৃত্তি শিক্ষার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা তা দেখা।
- মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক বা প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষালয়গুলিতে কি ধরনের বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে মহিলাদের সুবিধার্থে তা পর্যালোচনা করা।

লিঙ্গা বৈষম্য-এর প্রসঙ্গো কমিটি মন্তব্য করেন যে নারী পুরুষের মধ্যে যে জৈবিক বা লৈঙ্গিক প্রভেদ আছে তার প্রভাব কখনই বৌদ্ধিক ক্ষমতার উপর পড়তে পারে না। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উল্লেখ করে বলা হয় যে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে যে মনোবৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব বা সংলক্ষণ (Trait) দেখা যায় তার কারণ হল সামাজিক অনুবর্তন (Social Conditioning)। অতএব কিছু বিষয় ছেলেদের পড়ার জন্য এবং কিছু মেয়েদের পক্ষে উপযোগী এ ধারণা ভুল। অতএব নতুন সমাজ ব্যবস্থায় নারীপুরুষের সত্যিকারের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে—

- ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে যে শিক্ষার বৈষম্য আছে তা অবিলম্বে দূর করা।
- নারী পুরুষের প্রভেদ সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা জনগণের মধ্যে থেকে দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ শিক্ষা ছেলে মেয়েদের জন্য একই রকম হবে এবং এ ব্যাপারে কোন বিভেদ রাখা চলবে না। এমনকি সাধারণ পাঠক্রমের মধ্যেই গৃহশিক্ষার বিষয়টি সবার জন্যই অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(Various Recommendation)

সহশিক্ষা (Coeducation)

সহশিক্ষা সম্বন্ধে কমিটি মন্তব্য করে যে প্রাথমিক স্তরে সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে কর্তৃপক্ষ অথবা অভিভাবকদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে সহশিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করার অথবা পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের পড়ানো।

মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং পুরুষ প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষক ও মহিলাপ্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গো কমিটি মন্তব্য করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তিগত ক্ষমতা, আগ্রহ ও মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এ ব্যাপারে লিঙ্গা বৈষম্যের কোন ভূমিকা থাকা উচিত নয়। আধুনিক সমাজে পাঠক্রমের পৃথকীকরণ কখনই নারী পুরুষের বিভেদের উপর ভিত্তি করে হতে পারে না। তবে এই নতুন সমাজ ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠা করতে বিশেষ সময় লাগবে তাই কিছু কিছু মনোবৈজ্ঞানিক প্রভেদ মেনে নিলেও সর্বদাই চেষ্টা করতে হবে নারী পুরুষের সমানাধিকার সংক্রান্ত মূল্যবোধ ও সঠিক মনোভাব যেন গঠিত হয়।

এই স্তরে ছেলে ও মেয়েদের পাঠক্রমে অবশ্যই কোন প্রভেদ থাকবে না। 'ছেলেদের পড়ার বিষয়' বা 'মেয়েদের বিষয়' এই ধরনের ধারণাগুলি সামাজিক অনুবর্তনের দ্বারা গঠিত হয়। অতএব কমিটি প্রস্তাব রাখে যে এই সময় ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই সহজ সেলাই, হাতের কাজ, রন্ধন, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি শেখানো উচিত যাতে নারী পুরুষের প্রভেদ সংক্রান্ত ধারণাগুলি সহজে গড়ে উঠতে না পারে। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মহিলা শিক্ষিকা আরও বেশি সংখ্যায় নিয়োগ করতে হবে।

১৪ বৎসর পর্যন্ত সার্বজনীন যে শিক্ষা দেওয়া হবে তা ছেলে ও মেয়েদের একই ধরনের হওয়া উচিত এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনরকম পাঠ্যক্রমে কোন পার্থক্য করা হবে না এবং সাধারণ পাঠ্যক্রমে সবার জন্য গৃহবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

মিডল স্কুলের পরবর্তী পর্যায়ে বৃত্তি শিক্ষার শুরু হওয়া উচিত কারণ ১১/১২ বছরে শিক্ষার্থীদের ততখানি পরিণতমন হয়না যাতে তারা ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচন করতে পারে।

প্রত্যেক মিডল স্কুলে এক বা একাধিক কারিগরী শিল্প (Craft) শেখানো উচিত, যা ছেলে ও মেয়ে উভয়েই শিখবে।

এই স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলা দুই ধরনের শিক্ষাকর্মী থাকবে। প্রধানত ছেলেরা বেশি পড়ে এই রকম বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের জন্য ছাত্রী আবাস তৈরি করার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী। অভাবগ্রস্থ মেয়েদের বৃত্তির ব্যবস্থাও থাকা উচিত। সবশেষে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারার জন্য যানবাহনের সুবিধা থাকার কথাও কমিটি বলেছে।

কমিটি সুপারিশ করে যে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে বৃত্তি শিক্ষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ না করলেও কোন শিল্প বা হাতের কাজকে পাঠ্যক্রমের আবশ্যিক অংশ করতে হবে।

কমিটি আরও প্রস্তাব করে যে সাধারণ মাধ্যমিক পাঠক্রমের সাথে সাথে সমান্তরাল ভাবে বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে। এই বৃত্তি শিক্ষা নিম্নমাধ্যমিকের পরে শুরু হবে এবং তিন বছর ধরে চলবে। এই বৃত্তি শিক্ষা পাঠ্যক্রমটি বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে তৈরি হবে। এমন ধরনের বিষয় থাকবে যেগুলি মেয়েদের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হতে সাহায্য করবে। কমিটি আরও মন্তব্য করে কি কি ধরনের বৃত্তি বা পেশার প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে গবেষণা চালানো উচিত।

মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে পাঠ্যক্রম আবার বিভাজন করা উচিত যাতে ছাত্রীদের একটি অংশ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে এবং অন্য দলটি বিশেষ শিক্ষা নেবে যাতে তাদের বৃত্তিমূলক যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের বিষয় থাকবে যেগুলি প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

পাঠ্যগ্রন্থে বিশেষ করে ভাষা ও সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে মেয়েদের প্রয়োজন, অভিজ্ঞতা ও সমস্যা সম্বন্ধীয় বিষয় থাকা উচিত। কমিটি সুপারিশ করে যে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে দিয়ে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

হংস মেহতা কমিটি আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করে।

মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়। প্রয়োজনে মহিলাদের আংশিক সময়ের জন্য চাকুরীতে নিয়োগ করার সুপারিশ করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক বিষয় পড়ানোর জন্য মেয়েদের বিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া উচিত এবং বিভিন্ন বিষয় শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নতি করা উচিত। সুদক্ষ, পরিণত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার সাহায্যে যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়েছে।

(Bhakta Batsalam Committee)

(Committee to look into the cause for lack of public support particular in rural areas for girls education and to enlist public cooperation) :

মহিলা শিক্ষার ব্যাপারে জনগণের অনীহার কারণ কি, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এবং কি ভাবে জনগণের সহযোগিতা পাওয়া যায় তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে কমিটি।

জাতীয় মহিলা শিক্ষা পর্ষদ ১৯৬৩ সালের একটি মিটিং-এ ঠিক করে যে মহিলা শিক্ষার অগ্রগতির জন্য সাধারণ জনগণের সহযোগিতা কিভাবে পাওয়া যেতে পারে এ ব্যাপারে একটি ছোট কমিটি গঠন করা হবে। সেই মত, মাদ্রাজের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম. ভক্তবৎসলমের সভাপতিত্বে কমিটি প্রথমেই মন্তব্য করে যে নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য শিক্ষিত ও তথ্যাভিজ্ঞ জনগণের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে এক যুগ্ম দায়িত্বের মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

মহিলা শিক্ষার প্রসারের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য কমিটি নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি দিয়েছে

- বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য আলোচনা সভার আয়োজন
- সেমিনার, বেতার আলোচনা, পুস্তিকা প্রকাশ
- ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া
- মেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সব বেসরকারি সংস্থা, অথবা কল্যাণকর সংস্থাগুলি নিযুক্ত আছে তাদের সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া

মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছিল।

- শুধু বিদ্যালয়গুলির উন্নতিই নয়, রাজ্যের উচিত আরো বেশি সংখ্যায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, বিশেষ করে পাহাড়ী ও দূরবর্তী অঞ্চলে। এমনকি জনসংখ্যা যদি ৩০০ রও কম হয় তবুও সেই জায়গায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ৫ মাইলের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনেরও সুপারিশ করা হয়।
- বিদ্যালয় ভবনগুলিরও উন্নতি করা অত্যন্ত প্রয়োজন।
- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজকর্ম, শিক্ষামূলক কাজগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।
- মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষিকার সংখ্যা যথেষ্ট নয় বলে কমিটি আরও বেশি শিক্ষিকা নিয়োগ করার সুপারিশ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বেশি সংখ্যায় শিক্ষিকা নিযুক্ত করলে পিতামাতাদেরও ভরসা বাড়বে, বিশেষ করে যে বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মহিলা শিক্ষিকাদের বেতনের সাথে বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে, বিশেষ করে যারা প্রত্যন্ত স্থানে চাকুরী করেন এবং গ্রামাঞ্চলে থাকেন।

  প্রয়োজন হলে শিক্ষিকাদের আংশিক সময়ের জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে এবং চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা শিথিল করা প্রয়োজন, যদি দরকার হয়।

  যতদূর সম্ভব মহিলা শিক্ষকদের তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা দরকার।
- ভবিষ্যত শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার, এর জন্য ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করা দরকার এবং এই কলেজগুলিতে ছাত্রী আবাসও থাকা প্রয়োজন।
- মহিলা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতি করা দরকার, পরিদর্শকরা স্থানীয় পরিস্থিতির সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকবেন এবং প্রয়োজন হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরামর্শ দেবেন। আরো বেশি সংখ্যায় মেয়েদের বিদ্যালয়ে আনার জন্য মহিলা পরিদর্শকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। একটি স্বতন্ত্র আধিকারিক নিয়োগ করতে হবে। আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে আরো বেশি দায়িত্ব দিলে নারী শিক্ষার অগ্রগতি সম্ভব।
- সমাজ শিক্ষার প্রসারের জন্য বয়স্ক মহিলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং সাক্ষরতা কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব নেবে।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

- মহিলা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- বিনা ব্যয়ে বই, খাতা ও পোশাক বিলির ব্যবস্থা করা। শিক্ষিকাদের জন্য হস্টেল ও কোয়ার্টার্সে থাকার ব্যবস্থা করা।
- মাধ্যমিক স্তরের জন্য কমিটি বলে যে কেন্দ্রীয় সরকার মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করবে। বই, খাতা, পোষাক ইত্যাদি বিনা খরচে বিলি করার ব্যবস্থা করবে এবং বেশি সংখ্যায় শিক্ষিকা নিয়োগ করবে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিল্ডিং এর উন্নতি সাধন, কেন্দ্রের সাহায্যে

অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। নারীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। যদি সম্ভব হয় তাহলে রাজ্য সরকারগুলি স্থানীয় প্রশাসন বা অন্য কোন সংস্থার থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করবে। রাজ্য স্তরে নারীশিক্ষা পর্ষদ নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে সচেষ্ট হবে এবং উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে তৃণমূল স্তরে নারীশিক্ষার বিস্তারে সাহায্য করবে।

- পাঠক্রম সংক্রান্ত ব্যাপারে কমিটি বলে যে প্রাথমিক ও মিডল স্কুল স্তরে ছেলেমেয়েদের একই বিষয়ে পড়ানো যেতে পারে। এব্যাপারে হংস মেহতা কমিটির সুপারিশগুলি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- যে সব বিদ্যালয়ে যথেষ্ট জায়গা নেই এবং ভর্তির সংখ্যা অধিক সেখানে ডব্‌ল শিফ্‌টে পড়াশোনার কাজ চালানো যেতে পারে। বিদ্যালয়ের সময়সুচী ও ছুটিরদিন এর ব্যাপারে শিথিলতা রাখতে পারলে অনেক সময় মেয়েদের বিদ্যালয়ে আসার সুবিধা হয়, বিশেষ করে মেয়েরা যখন বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকে।
- সবশেষে যে সব রাজ্য মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে পশ্চাদমুখী তাদের বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যেমন বিহার, জম্মুকাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের নিজস্ব অনেক সমস্যা আছে। তাই এই রাজ্যগুলিকে আরও বেশি সচেষ্ট হতে হবে যাতে নারীশিক্ষার অগ্রগতি ঠিকমত হয়।

(Summary) :

এই এককে নারীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য সরকারের তরফে যে সমস্ত কমিটি কমিশন স্থাপন করা হয়েছে তাদের সুপারিশগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে সরকার স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই মেয়েদের শিক্ষা প্রসারে আগ্রহী। প্রথমের দিকে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার বিভেদের কথা ভাবা হলেও পরবর্তী পর্যায়ে লিঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমর্থন করা হয়নি। তদুপরি মহিলা শিক্ষার প্রসারে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা কি ভাবে করা যায় তার জন্যও সরকার কমিটি তৈরি করেছেন। সহশিক্ষার প্রতি প্রথম দিকে কিছুটা অনীহা দেখা গেলেও পরবর্তী পর্যায়ে এই বিষয়টিকে সমর্থনই করা হয়েছে। এই ভাবে ধীরে ধীরে মহিলাশিক্ষা ও পুরুষ শিক্ষাকে সমভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং মহিলাদের বৃত্তি শিক্ষা দিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন করার প্রচেষ্টা রয়েছে।

(Exercise)

-

১। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনে সহশিক্ষা সম্পর্কে কি বলা হয়েছিল?

২। দুর্গাবাই দেশমুখ কমিটির দুটি উদ্দেশ্য লিখুন।

৩। দুর্গাবাই দেশমুখ কমিটি মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে যে অপচয় হচ্ছে তা দূর করার জন্য যে উপায় বলেছিলেন তার দুটি উপায় লিখুন।

৪। হংস মেহতা কমিটির সহশিক্ষা প্রসঙ্গে দুটি সুপারিশ উল্লেখ করুন।

●

১। নারী শিক্ষা বিষয়ে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি লিখুন।

২। নারী শিক্ষা বিষয়ে কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। হংস মেহতা কমিটিতে নারীপুরুষের সামাজিক সমতা বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

৪। হংস মেহতা কমিটিতে নিম্নমাধ্যমিক ও মিডল স্কুলের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে?

●

১। দুর্গাবাই দেশমুখ কমিটির সুপারিশগুলি উল্লেখ করুন।

২। হংস মেহতা কমিটি নারী পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে কি সুপারিশ করেছিল?

৩। ভক্তবৎসলম কমিটির মতামতগুলি বিশদভাবে লিখুন।

❑

(Present Status to Women, A brief account of growth of Women's Education)

(Structure)

(Demography)

(Introduction) :

মহিলা শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গো প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত যে বিষয় তা হল সমাজে নারীর স্থান। কারণ সমাজে মহিলাদের পদমর্যাদার উপর নির্ভর করে তাদের শিক্ষার অধিকার বা শিক্ষার সুযোগ। যদিও সংবিধান ও আইন অনুযায়ী মহিলারা সমান অধিকার ভোগ করেন কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই নারী শিক্ষার বিকাশ ও নারী শিক্ষার সমস্যার সাথে সাথে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার যে যোগসূত্র রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। অন্যথায় মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে আনা গেলেও বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাবে না। মহিলা শিক্ষার অগ্রগতির ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সামাজিক সচেতনতার অভাব নারীশিক্ষার মন্থর গতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। এই এককে তাই সমাজে মহিলাদের স্থান ও নারীশিক্ষার অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

(Objectives) :

এই এককটি পাঠের পর শিক্ষার্থীরা যে সব বিষয় সম্বন্ধে অবগত হবেন তা হল এই প্রকার—

- বর্তমানে আমাদের দেশে নারীর সামাজিক অবস্থা কেমন,
- মেয়েদের সামাজিক পদমর্যাদার সূচকগুলি কী কী,
- মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ,
- বিভিন্ন শিক্ষাস্তরে মহিলাদের প্রবেশের হার-এর পরিসংখ্যান,
- নারীশিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশমূলক দৃষ্টিভঙ্গি কেন নেওয়া প্রয়োজন,
- মহিলা শিক্ষার প্রসারে কী কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

(Present Social Status of Women) :

সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত সরকার নারীশিক্ষার বিকাশের জন্য বিভিন্ন সরকারি নীতি ও বিকাশমূলক কার্য্যসূচী গ্রহণ করেছে এবং এই গুলির বাস্তব রূপায়ণও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। এরফলে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মেয়েদের শিক্ষার প্রসার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মহিলারা আমাদের দেশে উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা পাচ্ছেনা উপরন্তু প্রায়শই মেয়েদের হিংসাত্মক আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং সামাজিক সুবিচার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গ বৈষম্যের দরুন মহিলারা নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনা। লিঙ্গ বৈষম্যের বীজ বপন করা হয় পরিবারের মধ্যে, পারিবারিক শিক্ষাই শিশুর মনে বিভিন্ন ধরনের মনোভাবের সৃষ্টি করে। মহিলাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের উৎসই হল পারিবারিক মিথস্ক্রিয়া। তাই বধু নির্যাতন, পণপ্রথা, মেয়ে পাচারের মত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আমাদের দেশে প্রায়শই দেখা যাচ্ছে।

সবচেয়ে বড় কথা হল আমাদের দেশের গরীব লোকেদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নয়নের মধ্যেও লিঙ্গ বৈষম্য প্রকট হয়ে আছে।

(Demographic nature and Characteristics)

মহিলাদের সমাজে বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করতে জনসংখ্যার প্রকৃতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ মেয়েরা যে সমাজে দুর্বল তার একটি প্রকাশের মাধ্যম হল জনসংখ্যা। সাধারণভাবে মনুষ্য প্রজাতিতে নারী পুরুষের অনুপাত ৫০ : ৫০ হওয়ার কথা যদিও বেশিরভাগ উন্নতশীল দেশে পুরুষ অনুপাতে মহিলার সংখ্যা বেশি কারণ মহিলাদের আয়ু সাধারণত পুরুষের তুলনায় বেশি। কিন্তু আমাদের দেশে ২০০১-এর জনগণনায় দেখা গেছে যে প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে মহিলার সংখ্যা ৯৩৩ এবং ১৯৯১-এ এই সংখ্যা ছিল ৯২৭। ০-৬ পর্যন্ত বয়সের শিশুদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা কম দেখা যায় বিশেষ করে অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত রাজ্যগুলিতে যেমন পাঞ্জাব, হরিয়ানা ইত্যাদি। এর কারণ সব সময় অর্থনৈতিক নয় বরং অনেক সময় সামাজিক ব্যবস্থাও দায়ী। পণপ্রথার জন্য কন্যাসন্তান কাম্য নয় তাই কন্যা শিশুভ্রূণ হত্যার ঘটনা প্রায়ই

শোনা যাচ্ছে। তাছাড়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুত্র সন্তানকে আদরযত্ন বেশি করা হয় এবং গরীব সংসারে কন্যা সন্তান অবহেলা ও অপুষ্টিতে প্রাণ হারায়।

(Health and Family Welfare)

সমাজে মহিলাদের মর্যাদা কতখানি তার আর একটি মাপকাঠি হল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের প্রকৃতি। এখনও অযত্ন ও অবহেলার দরুণ প্রসূতি মৃত্যুর হার আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত ভাবে বেশি। ২০০১-এ জনগণনায় দেখা যাচ্ছে এখনও আমাদের দেশে প্রসূতি মৃত্যুর হার প্রত্যেক এক লক্ষে প্রায় ৪০৭। আরও একটি মহিলা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা হল রক্তাল্পতা। এছাড়াও অপুষ্টি, যক্ষা, যৌনরোগ, ম্যালেরিয়া ও জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাবও মেয়েদের মধ্যে বেশি। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ্ সার্ভেতে দেখা যায় প্রায় ৪৬ শতাংশ অল্পবয়সী প্রসূতি মায়েরা রক্তাল্পতায় ভোগে। ৫১ শতাংশ মহিলা পুষ্টির অভাবজনিত রক্তাল্পতায় ভোগে।

(Women's Literacy)

আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও গত কয়েক বছরে এই হার বেশ খানিকটা বেড়েছে। কিন্তু সমাজে মহিলাদের স্থান বা মর্যাদা যে যথেষ্ট নয় তার আর একটি সূচক মহিলা ও পুরুষের মধ্যে সাক্ষরতার হারের তফাৎ। ২০০১ সালের জনগণনায় মহিলা সাক্ষরতার হার ছিল ৫৪.১৬ শতাংশ যা ১৯৮১ তে ছিল ২৯.৭৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ দপ্তরের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ২০০৪-০৫-এ ভারতের সাক্ষরতার হার ৬৭.৩০। এর মধ্যে পুরুষ সাক্ষরতা ৭৭.০০% এবং মহিলা সাক্ষরতার হার ৫৭.০০%। নারী পুরুষের মধ্যে এই শিক্ষার অসমতা সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্যের বিষয়টি ইঙ্গিত সূচিত করে।

(A Brief Account of the progress of Women's Education) :

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই স্ত্রীশিক্ষার হার আমাদের দেশে খুবই কম ছিল এবং ২০০১ এর জনগণনা ও ২০০৪-০৫ এর MHRD এর পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে এই হার যথেষ্ট বেড়েছে।

নীচে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তা এই কথাই প্রমাণ করে।

(Rate of enrolement at different stages of education)

বিভিন্ন শিক্ষাস্তরে ভর্তির হার (Enrolment)									
	(Class I-V)			(Class VI-VIII)			(Class IX-XII)		
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট
২০০৪-০৫	৬৯.৭	৬১.১	১৩০.৮	২৪.৫	২২.৭	৫১.২	২১.৭	১৫.৪	৩৭.১

শতকরা হিসেবে দেখা যায় ২০০৪-০৫ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট প্রবেশের হার নিম্নরূপ

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভর্তির হার	৪৬.৭%
উচ্চপ্রাথমিক স্তরের ক্ষেত্রে	৪৪.৪%
মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে	৪১.৫%
এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে	৩৮.৯%

শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েদের ভর্তির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকলেও একটি বিশেষ সমস্যা হল ড্রপ আউটের। MHRD, Govt. of India র Selected Educational Statistics (২০০৪-০৫) এর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে এখনও প্রায় মেয়েদের অর্ধেক অংশ উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারছে না।

প্রাথামিক স্তরে ড্রপ আউট (২০০৪-০৫)		
	ক্লাস I থেকে ক্লাস V	ক্লাস I থেকে ক্লাস VIII
ছেলে	৩৩.৭৪	৫১.৮
মেয়ে	২৪.৬	৫২.৯
মোট	৩১.৫	৫২.৩

ড্রপ আউটের সমস্যা মেয়েদের মধ্যে সামান্য বেশি হলেও সামগ্রিক ভাবে এটি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিশেষ সমস্যা। কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর যদি সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্পূর্ণ না করা যায় তাহলে সংবিধানের মৌলিক নির্দেশ রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

(From Welfare perspective to Development perspective)

মহিলা শিক্ষার বিষয়টিকে প্রথমে কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা হয়েছিল (প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬) এবং দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এই একই অভিমুখ (approach) অনুসরণ করেছিল)। কিন্তু ষষ্ঠ পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) প্রথম বিভিন্ন বিকাশমূলক কার্যসূচীর সাথে নারীশিক্ষার বিষয়টিকে যুক্ত করে। এর ফলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী (Beneficiary oriented Schemes) চালু করা হয় এবং নারীশিক্ষা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় ও মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের দক্ষতামূলক কাজে (Skilled) ও সেমিস্কিল্ড কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। নবম পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) এই জন্য বিশেষ কৌশল (Strategy) অবলম্বন করা হয় তা হল উইমেনস্ কমপোনেন্ট প্ল্যান (Women's Component plan) যার ফলে বিকাশমূলক পরিকল্পনার শতকরা ৩০ ভাগ অর্থ মহিলাদের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(Special programmes for Women's Education vis-a-vis Women's Progress)

- সর্বজনীন টীকাকরণ প্রোগ্রাম
- ICDS (ইনটিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কীম)
- জাতীয় জনসংখ্যা নীতির আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন শিশুমৃত্যুর হার কমানো, প্রসূতি মৃত্যুর হার কমানো
- জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের (১৯৮৮) পূর্ণ সাক্ষরতা লক্ষ্য পূরণ
- সাক্ষরোত্তর কর্মসূচী (PLC – Post Literacy Campaign)
- প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা যার সাহায্যে ৭.৩ মিলিয়ন উপকৃত হয় এবং এদের মধ্যে ৬১ শতাংশ মহিলা
- মহিলা সমক্ষ পরিকল্পনা যার সাহায্যে অর্থনৈতিক ভাবে অনুন্নত মহিলারা উপকৃত হয়েছেন
- SHG (Self Help Groups) স্বরোজগার প্রকল্পের সাহায্যে ২০০০ নাগাদ প্রায় ২ মিলিয়ন মহিলা উপকৃত হয়
- ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল পলিসি (২০০০) মহিলা কৃষিজীবিদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে
- আরো কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচী যা নারীশিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষ ভাবে জড়িত তা হল স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা, রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ, সাপোর্ট ফর ট্রেনিং এ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট (STEP) ইত্যাদি। এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলা।
- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা হল ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর এডুকেশন অফ গার্লস অ্যাট এলিমেণ্টারী লেভেল (NPEGEL)। ২০০৩-এর জুলাই মাসে সর্বশিক্ষা অভিযানের অংশ হিসাবে এই NPEGEL গঠিত হয়। EDD বা এডুকেশনালি ব্ল্যাকওয়ার্ড ব্লক বা পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে যেখানে তপশিলি জাতি বা উপজাতির সংখ্যা বেশি এবং সাক্ষরতার হার শতকরা ৫ ভাগ অথবা ১০ ভাগ, সেই সব জায়গায় বিশেষ সাহায্য করা হচ্ছে।
- তপশিলি জাতি, উপজাতির সুবিধার্থে আরও একটি পরিকল্পনা হল কস্তুর বা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় স্কীম যার সাহায্যে অনুন্নত শ্রেণির মেয়েদের জন্য বোর্ডিং স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সরকারি বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে নারীশিক্ষার প্রগতি অবশ্যই সুনিশ্চিত হয়েছে। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে মহিলারা নিজস্ব স্থান করে নিতে সমর্থ হচ্ছেন। তবুও অনুন্নত শ্রেণি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলোক পৌঁছে দেওয়ার জন্য এখনও অনেক পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় বাধা হল সমাজে নারীর পদমর্যাদা। নিয়মাফিক পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার থাকলেও এ কথা সত্যি যে নারীর অধিকার বা ক্ষমতা অনেকাংশে সীমিত এবং সত্যিকারের ক্ষমতায়ণ (empowerment) না হলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার সম্পূর্ণভাবে সার্থক হবে না। পরবর্তী এককে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হবে।

(Summary) :

নারী শিক্ষার সাথে সমাজে নারীর সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। তাই সমাজে নারীর স্থান কোথায় এবং সমাজ নারীকে কতখানি মর্যাদা দেয় তা আলোচনা করে দেখা দরকার। আমাদের দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এখানকার পুরুষশাষিত মহিলারা অবহেলিত ও নির্যাতিত। সামাজিক বহু অন্যায় ও অবিচারের শিকার হয় মেয়েরা। এর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন এসে পড়ে শিক্ষা ব্যবস্থায়। তাই দেখা যায় শিক্ষার সর্বস্তরে এবং বিশেষ করে সাক্ষরতার হারের ক্ষেত্রে মেয়েরা পিছিয়ে থাকছে। যদিও এই বিভেদ ক্রমশঃ কমছে তবুও মেয়েরা তাদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা পায়না। শুধুমাত্র শিক্ষায় অনগ্রসরতাই নয় অর্থনৈতিক দিক থেকেও মেয়েদের শোষণ করা হয়ে থাকে। এই অবস্থায় ভারত সরকার বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেছে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মহিলা শিক্ষার উন্নতি ঘটাচ্ছে ও মহিলাদের জীবনের মান উন্নয়নে সাহায্য করে চলেছে।

(Exercise) :

●

১। জনসংখ্যার একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন যা মহিলাদের সামাজিক অবহেলা চিহ্নিত করে।

২। মহিলাদের সামাজিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেক করুন।

●

১। মহিলা উন্নয়নে কল্যাণমূলক ও বিকাশমূলক দৃষ্টিকোণ বলতে কি বোঝায়?

২। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মেয়েদের অনুপ্রবেশের বর্ণনা দিন।

●

১। ভারতে মহিলাদের বর্তমান অবস্থা ও পদমর্যাদার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২। ভারত সরকার নারী শিক্ষা ও বিকাশের জন্য কি ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তা বিস্তারিত আলোচনা করুন।

❑ (Women's Education, Empowerment and Social Transformation)

(Structure)

(Introduction) :

নারীশিক্ষার মন্থর অগ্রগতির একটি বড় কারণ হল সমাজে মেয়েদের অবহেলিত স্থান। মেয়েদের অনেক সময়ই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তার ফলে মেয়েদের শিক্ষা ও বিকাশ দুটিই ব্যহত হয়ে থাকে। অতএব বলা যায় যে নারীশিক্ষার পূর্বশর্ত অনুযায়ী মহিলাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দরকার। আরো প্রয়োজন হল সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদি যা নারীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে তা দূর করা। অর্থাৎ শিক্ষার বিস্তারের সাথে সাথে নারী মর্যাদা ও ক্ষমতায়ণের কার্য্যসূচীও গ্রহণ করা দরকার না হলে নারী

শিক্ষার অগ্রগতি ব্যহত হবে। এই এককটিতে নারী ক্ষমতায়ণ এর বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করা হয়েছে এবং সরকার যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

(Objectives) :

এই এককটিতে ক্ষমতায়ণের বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর সাথে অন্ধসংস্কার এবং প্রাচীন ধ্যানধারণা কি ভাবে মহিলাদের অগ্রগতির পথে বাধা হয় তাও আলোচিত হয়েছে। অতএব এই এককটি পড়ার পরে শিক্ষার্থীরা যে সব বিষয় সম্বন্ধে অবগত হবেন তা হল—

- বর্তমান সমাজে মহিলাদের স্থান কোথায়,
- নারী ক্ষমতায়ণ বলতে কি বোঝায়,
- নারী ক্ষমতায়ণের বিভিন্ন দিকগুলি কি কি,
- নারী ক্ষমতায়ণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি,
- দশম পরিকল্পনায় নারী ক্ষমতায়ণের জন্য কি কি কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে,
- নারী ক্ষমতায়ণের সাথে কি ধরনের সামাজিক পরিবর্তন আসতে পারে।

(Women's Education and Empowerment) :

বাস্তবে সামাজিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন ভারতবর্ষের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বার বার নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের মুখবন্ধ, প্রধান অধিকার, দায়িত্ব ও নির্দেশাবলীগুলি শুধুমাত্র নারী ও পুরুষের সমান অধিকারই ঘোষণা করেনি তার সাথে রাষ্ট্রকে মহিলাদের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেছে। আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আইন, বিকাশমূলক পরিকল্পনা ইত্যাদির লক্ষ্যই হল সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রগতি সুরক্ষিত করা।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৮৭৪-৭৮) পর থেকে নারীশিক্ষার ব্যাপারে সরকারি নীতির একটি বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। এর আগে মহিলাদের অগ্রগতি বা শিক্ষার ব্যাপারটিকে একটি কল্যাণমূলক (Walfare) কর্মসূচী বলে ধরা হত কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এটিকে বিকাশমূলক (Developmental) কর্মসূচী বলে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। আরও পরে যে নীতিটি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে তা হল ক্ষমতায়ণ ছাড়া সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। এ ব্যাপারে যে সব উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি ঘটে তা হল,

- জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিষ্ঠা (১৯৯০) যার উদ্দেশ্য হল নারীর সাধারণ অধিকার ও আইনগত অধিকার রক্ষা করা।

- সংবিধানে ৭৩ ও ৭৪ নম্বর সংশোধন (১৯৯৩) যার সাহায্যে পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটির মত স্থানীয় সরকারের মধ্যে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ।
- এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সাক্ষর করে ভারত মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছে। এগুলি হল কনভেনশন অন এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অপ ডিসক্রিমিনেশন (CEDAW ১৯৯৩), মেক্সিকো প্ল্যান অফ এ্যাকশন (১৯৭৫) বেইজিং ঘোষণা (১৯৯৫) ইত্যাদি।

(Present Social Status of Women)

বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে সমাজে মহিলাদের মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেলেও নারী ও পুরুষের সামাজিক ব্যবধান এখনও প্রকট। যে সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই বৈষম্য চোখে পড়ে তা হল—

- সাধারণ জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত আমাদের দেশে ক্রমশঃ কমেছে, বিশেষ করে কয়েকটি রাজ্যে যেমন হরিয়ানা, পাঞ্জাব ইত্যাদি।
- সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর হিংসাত্মক ও আক্রমণধর্মী আচরণের সংখ্যাও অত্যন্ত বেশি।
- মেয়েদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব প্রায়শ দেখা যায়।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সম্পদ ভোগ করার থেকে অনেক মহিলাই বঞ্চিত বিশেষ করে অনুন্নত উপজাতি শ্রেণির মহিলাদের ক্ষেত্রে। ফলে তারা সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্ন এবং দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত।

(Goals and Objectives of Women's Empowerment)

ভারত সরকারের নীতি হল মহিলাদের বিকাশমূলক অগ্রগতি ও ক্ষমতায়ণ। সরকারি এই নীতিগুলি হল

- এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে মহিলারা তাদের নিজস্ব সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে।
- আইনসম্মত অধিকার ও স্বাধীনতাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারার জন্য মহিলাদের বিশেষভাবে সাহায্য করা।
- দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যসূচীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারার মত অবস্থা সৃষ্টি করা।
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বৃত্তি, চাকুরী, সমান বেতন, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিরাপত্তা, সমাজে নিরাপত্তা ইত্যাদি ব্যাপরে পুরুষদের মত মহিলাদেরও সমান অধিকার ও সমান সুযোগ এর ব্যবস্থা করা।
- আইন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে মহিলাদের প্রতি অন্যায়, অবিচার ও হিংসাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধ করা।
- নারী ও পুরুষ উভয়ের সহযোগিতায় মেয়েদের সম্বন্ধে যে সামাজিক নেতিবাচক মনোভাব আছে তা দূর করার ব্যবস্থা করা।

- সমস্ত বিকাশমূলক কর্মসূচীগুলিকে মহিলা উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা।
- সবশেষে এই ধরনের সামাজিক উন্নয়নে সরকার ও সভ্যসমাজ (Civil Society) কে এক সাথে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করা।

(Women Empowerment)

ক্ষমতায়ণ কথাটির সংজ্ঞা দেওয়া আবশ্যক। মহিলাদের সামাজিক ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় নারী ক্ষমতায়ণের অর্থ হল সমগ্র সমাজের পটভূমিতে যে সামাজিক ক্ষমতার ও অধিকারের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে তার পরিবর্তন (Transformation of power relations throughout Society)। ক্ষমতায়ণের ধারণাটি দুটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—

এক, নারী পুরুষের সমতা (Gender Equality)

দুই, মানবাধিকার

অর্থাৎ যে কোন সভ্য সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকার থাকা যেমন বাঞ্ছনীয় সেই রকম প্রতিটি নাগরিকের যে জন্মগত অধিকার আছে তা সুরক্ষিত রাখবার দায়িত্বও রাষ্ট্রের ও সমাজের। এই ক্ষমতায়ণ এর বিষয়টি আবার নির্ভর করে তিনটি নীতির উপর—অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণ, সামাজিক ক্ষমতায়ণ ও মহিলাদের ন্যায্য অধিকার।

(Economic Empowerment of Women)

মহিলাদের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত পরিশ্রম করেন তাদের সংসারের জন্য। কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থায় এই অক্লান্ত পরিশ্রমের বদলে তাদের কোন রকম অর্থনৈতিক পারিশ্রমিক নেই যার জন্য অর্থনৈতিক ক্ষমতা না থাকায় তাদের সমাজে দুর্বল শ্রেণি বলে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে সব পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা পরে আলোচনা করা হবে।

(Social Empowerment of Women)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগে জড়িত আর একটি বিষয় হল সামাজিক ক্ষমতায়ণ যার অর্থ হল সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সামাজিক ক্ষমতায়ণের উপাদানগুলি হল—

- সাংসারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের অধিকার
- আত্মবিশ্বাস
- পরিবারে নারীর পদমর্যাদা রক্ষা
- জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা
- নিজস্ব অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা

এই সামাজিক পরিবর্তন আনতে হলে তৃণমূল স্তরে মহিলাদের যে পরাধীন ভূমিক তা নিরসন করা প্রয়োজন। এর জন্য আবার বৃহৎ স্তরে (macrolevel) এ বিকাশমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করাও দরকার। অর্থাৎ

অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক ক্ষমতা পরস্পর সম্পর্কিত। ক্ষমতায়ণের মূল বিষয়টি হল অধিক সংখ্যায় মহিলাদের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করা।

(Gender Justice)

আগেই বলা হয়েছে ক্ষমতায়ণ এর বিষয়টি মানবাধিকারের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব প্রতিটি নাগরিকের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষিত করার উপর ক্ষমতায়ণ বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভর করছে। এরজন্য আইনী ব্যবস্থার সাহায্য প্রয়োজন। মহিলারা যাতে তাদের অধিকার সম্বন্ধে অবহিত থাকে এবং প্রয়োজন হলে আইনের সাহায্য নিয়ে অবিচার ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করাও দরকার।

(10th Five year plan and Women's Empowerment) :

শিক্ষার সাহায্যে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ও মানবাধিকার দেওয়ার জন্য দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

- ২০০৭ এর মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা (Education for All) এই কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণের জন্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।
- সর্বশিক্ষা অভিযানের সাহায্যে যে সব মেয়ে বা কন্যা শিশুর কাছে পৌঁছানো যায়নি তাদের শিক্ষার আওতার মধ্যে আনার চেষ্টা করা হবে।
- ১৯৮৬ ও ১৯৯২ এর জাতীয় শিক্ষা নীতি অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষায় যে লিঙ্গ বৈষম্য আছে তা কমাতে হবে।
- 'সকলের জন্য শিক্ষা' এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য সঠিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এরজন্য শুধু সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ সাহায্য ছাড়াও পাঠ্যপুস্তক ও পাঠক্রমে যে লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব (Gender bias) আছে তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সঠিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করে মেয়েদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দারিদ্র সীমারেখার নীচে রয়েছে যে মেয়েরা তাদের জন্য আর্থিক সহায়তার কথা বলা হয়েছে।
- দশম পরিকল্পনার আর একটি প্রয়োজনীয় দিক হল মেয়েদের জন্য বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো। এর জন্য প্রত্যেক জেলায় মহিলাদের জন্য ITI (Industrial Training Institute) প্রতিষ্ঠিত করা হবে। মেয়েদের এই সব কোর্সে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে। ইলেকট্রনিক্স, কমপিউটার, বায়োটেকনোলজি, ফ্যাশান ডিজাইনিং, গণমাধ্যম ইত্যাদি কোর্সে মহিলাদের বেশি সংখ্যায় আনার চেষ্টা করা হবে।
- উচ্চশিক্ষায় আরও বেশি সংখ্যায় মেয়েরা যাতে আসে তার জন্য কলেজ স্তরে মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

(Programmes for Economic Empowerment)

দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে সব ব্যক্তি দারিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাস করে তাদের ৭০ শতাংশ নারী। তাই অর্থনৈতিক অগ্রগতি ছাড়া নারীর ক্ষমতায়ণ সম্ভব নয়।

দারিদ্র দূরীকরণের জন্য যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তার অন্যতম মূল নীতি হ'ল মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবস্থা অর্থাৎ স্বল্পসুদে মহিলাদের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে ছোট ব্যবসার জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাতে তারা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা—

- যেসব কর্মসূচীর সাহায্যে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে সেগুলি হল—স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্ব রোজগার যোজনা, স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা, রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ, সাপোর্ট ফর ট্রেনিং এ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম (STEP), ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টার ইত্যাদি। এই সব কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা।
- অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে প্রায় ৯০ শতাংশ মহিলা কর্মরত। এদের জন্য ন্যূনতম বেতন ধার্য করা এবং কাজের পরিবেশ সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যকর করার ব্যবস্থা কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবার কথা ঘোষণা করা হয়। সামাজিক বনসৃজন প্রোগ্রাম এবং জয়েন্ট ফরেষ্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই যৌথ পাট্টা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়।
- সরকারের দায়িত্ব হল নিয়োগকারী সংস্থাগুলিতে কর্মরত মহিলারা আইন অনুযায়ী যে সব সুবিধা পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছে কি না তা দেখা।
- মহিলা কর্মীদের পুনঃশিক্ষণ ও ক্রমান্বয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা দরকার। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বিকাশ, হস্তশিল্প, পশমশিল্প ও কুটির শিল্পে মেয়েরা যাতে কাজ করতে পারে তার জন্য তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব।
- সরকারি সংস্থায় শতকরা ৩০ ভাগ চাকুরী মহিলাদের জন্য সুরক্ষিত করা।

(Programmes for Social Empowerment)

সামাজিক ক্ষমতায়ণের জন্য যে সব পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল নিম্নরূপ—

- মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করে অনুন্নত শ্রেণির মহিলাদের জন্য ন্যূনতম সাধারণ পরিষেবা যেমন প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিবার কল্যাণ, শিশুকল্যাণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- জাতীয় জনসংখ্যা নীতি (২০০০)-তে যে সব লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল যেমন শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩০ ও প্রসূতি মৃত্যুর হার কমানো (প্রতি ১ লাখে ১০০) তা পূরণ করার ব্যবস্থা করা।
- প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদ্যোগ যোজনা কর্মসূচীর সাহায্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেওয়া এছাড়া টীকাকরণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে শিক্ষা, পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদিও এই কর্মসূচীর আওতায় পড়ে।

- ১৯৮৬-র শিক্ষানীতি (সংশোধিত নীতি ১৯৯২) তে যে "নারী পুরুষের সাম্যের জন্য শিক্ষা" নীতির কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবে রূপায়িত করা।
- শিক্ষার সব স্তরে ও সব ক্ষেত্রে মহিলাদের সহজ ও সমান সুযোগের ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে বৃত্তি শিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষায় মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত।
- মধ্যাহ্নকালীন আহার, ছাত্রী আবাস, পাঠ্যপুস্তক, যাতায়াত-এর জন্য গাড়ী ও বিনাখরচে স্কুলের পোশাক এবং বিতরণ ইত্যাদি ব্যবস্থার সাহায্যে মেয়েদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করতে উৎসাহ দেওয়া ও ড্রপ আউট এর হার কমানোর চেষ্টা করা।
- মেয়েদের জন্য ইনডাসট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিউট প্রতিটি জেলায় দরকার এবং যে সব ব্যবসায় লাভ হয় সেই ধরনের বৃত্তি বা ব্যবসার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- গণমাধ্যমগুলিতে মহিলাদের সম্বন্ধে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করতে উৎসাহ দেওয়া।
- প্রশাসনিক স্তরে কর্মচারীদের মধ্যে মহিলাদের সমানাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা আনার জন্য উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

(Enforcing Women's rights and equal status)

মহিলাদের সমাজে ন্যায় বিচার পেতে পারে তখনই যখন সমাজে নারী পুরুষের কৃত্রিম বিভেদ দূর করা সম্ভব। এই বিভেদ দূর করার জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, কৃষ্টিমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। যেমন—

- শিশুকন্যার ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ। ভারতীয় দণ্ডবিধির নির্দেশ অনুযায়ী ও আইন অনুযায়ী শিশুকন্যার হত্যা বন্ধ করার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী।
- মহিলাদের প্রজনন সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষমতা ও এ বিষয়ে তাদের অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতায়ণ।
- শ্রমদপ্তর মন্ত্রকের সহায়তায় মহিলা কর্মীদের শোষণ বন্ধ করা।
- মহিলাদের প্রতি সুবিচারের জন্য বিভিন্ন মহিলা সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন।
- কেন্দ্র ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ।
- মহিলাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, হিংসাত্মক আক্রমণ রোধ করার জন্য আইন ও পুলিশি ব্যবস্থাকে জোরদার করা।
- নারীদের বিকাশের মাপকাঠি বা সূচক নির্ণয়।
- নারী পুরুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রণয়ন করার প্রচেষ্টা।

(Social Changes) :

সামাজিক সমতা ও সমান অধিকার পেতে হলে মহিলাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণ একান্ত দরকার। সামাজিক অধিকার নির্ভর করে মহিলাদের সাক্ষর করে তোলার উপর এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের সাহায্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার উপর। এছাড়া মহিলারা সমকক্ষ হতে পারে যখন আইনী ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের সঠিক ধারণা জন্মায় ও তারা তাদের নিজস্ব ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করতে সক্ষম হয়।

মহিলা ক্ষমতায়ণের জন্য দুটি স্তরের পরিবর্তন প্রয়োজন

- এক, ম্যাক্রোস্তরে বিকাশ মূলক কর্মসুচী গ্রহণ
- দ্বিতীয়, মাইক্রোস্তরে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে মহিলাদের বর্তমান হীনতর অবস্থার উন্নয়ন।

ধরে নেওয়া যায় যে অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিক্ষা মহিলাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ছাড়াও গোষ্ঠীর মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে। কারণ মহিলারা যখন সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত হন তখন তাঁরা অন্যদের কাছে আদর্শ রূপে (role model) চিহ্নিত হন এবং এর ফলে সামাজিক পরিবর্তন হওয়া সম্ভবপর হয়।

(Summary) :

এই এককে মহিলাদের শিক্ষা ক্ষমতায়ণ ও সামাজিক পরিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

এ প্রসঙ্গে মূল বক্তব্যটি হল নারীশিক্ষাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা বা শুধুমাত্র নারীশিক্ষার উন্নতির চেষ্টা করা খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না। মেয়েদের শিক্ষার সাথে সাথে মেয়েদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে একসাথে বিচার করতে হবে। কারণ মহিলা শিক্ষার মন্থর গতির অন্যতম কারণ হল সমাজে মহিলারা পুরুষের অধীনস্থ। তাই স্বাধীনভাবে নিজস্ব মতামত পোষণ করা বা কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ তাদের থাকে না। তাই সরকারি নীতিতে নারীশিক্ষার সাথে নারীর অর্থনৈতিক প্রগতি ও ক্ষমতায়ণের বিষয়টিকে একত্রিত করে দেখা হয়েছে। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মেয়েদের ক্ষমতায়ণ সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে সরকারি নীতি কি হবে তাও ঘোষণা করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ভারত সরকার যে তিনটি নীতি ঘোষণা করেছেন তা হল অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণ, সামাজিক ক্ষমতায়ণ ও সামাজিক অধিকার সুনিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ণের যে সব কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে বা হবে তাও এই এককে উল্লেখ করা হয়েছে।

সবশেষে এই ক্ষমতায়ণের মধ্যে দিয়ে যে সামাজিক পরিবর্তন হবে বলে আশা করা যায় তা নারী পুরুষের সমান অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঠিক বিকাশেরও বৃদ্ধির জন্য নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতির একান্ত প্রয়োজন।

(Exercise) :

•

১। নারী ক্ষমতায়ণ বলতে কি বোঝায়?

২। ১৯৭৪-৭৮ এর পর থেকে নারী শিক্ষার ব্যাপারে সরকারি নীতিতে একটি বিশেষ পরিবর্তন আসে; এই পরিবর্তন কি?

৩। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে কোন তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করা হয়েছে?।

৪। সকলের জন্য শিক্ষা (Education for all) এই কর্মসূচীতে মেয়েদের শিক্ষা প্রসঙ্গে পাঠ্যক্রমে কি পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়েছে?

•

১। সামাজিক ক্ষমতায়ণ বলতে কি বোঝায়?

২। ক্ষমতায়ণ কি ভাবে সামাজিক পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারে?

৩। মেয়েদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণের জন্য সরকার কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে?

৪। নারী ক্ষমতায়ণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি?

•

১। নারীশিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়ণের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২। নারী ক্ষমতায়ণ বলতে কি বোঝানো হয়? নারী ক্ষমতায়ণকে বাস্তবায়িত করতে হলে কি ধরনের কার্য্যসূচী নেওয়া প্রয়োজন।

৩। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীশিক্ষার অগ্রগতি ও নারী ক্ষমতায়ণের জন্য কি কি কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করুন।

❑ (Trends of research in Women's Education)

(Structure)

(Introduction) :

যে কোন বিজ্ঞানে গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কারণ গবেষণার সাহায্যে নতুন তথ্য ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে। শুধু নতুন তত্ত্বই নয় এই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে মনুষ্য সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির চেষ্টা করা হয়ে থাকে। তাই গবেষণার সাহায্য ছাড়া কোন বিজ্ঞানের বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই গবেষণামূলক কাজের ভূমিকা অপরিসীম। এই এককে তাই গবেষণা ও নারী শিক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল। একমাত্র গবেষণা লব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই নারী শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে।

(Objectives) :

শিক্ষামূলক গবেষণার বিভিন্ন অভিমুক বা পদ্ধতি (method) আছে। এই বিভিন্ন পদ্ধতিতে গবেষণার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন কোন গবেষণা পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয় তা জানা থাকা দরকার। এই এককটি সম্পূর্ণ করার পর শিক্ষার্থী যে সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবেন তা হল—

- শিক্ষাক্ষেত্রে কি কি ধরনের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়,
- নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে কি কি ধরনের শিক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে,
- নারীশিক্ষা গবেষণায় পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ ও গুণগত তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা কোথায়,
- নারীশিক্ষা গবেষণায় বর্তমানে কোন্ ধরনের পদ্ধতির আধিক্য দেখা যায়।

(Different Types of Research in Education) :

সাধারণভাবে শিক্ষামূলক গবেষণাকে উদ্দেশ্য অনুসারে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই দুটি হল

(Theoretical Research)

(Action Research)

তাত্ত্বিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল কোন বিষয়ে নতুন তথ্যের আবিষ্কার ও প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবন ও পুরাতন তত্ত্বের পরিবর্তন অথবা পরিমার্জন। শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধির তত্ত্ব, শিখনের তত্ত্ব ইত্যাদি এই শ্রেণিভুক্ত।

অন্যদিকে প্রয়োগমূলক গবেষণায় বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন ক্ষীণবুদ্ধি অথবা প্রতিভাবান শিশুর শিক্ষণ পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত ইত্যাদি। অবশ্য শিক্ষণমূলক গবেষণায় এই ধরনের শ্রেণীকরণ একটি কৃত্রিম পন্থা। কারণ তাত্ত্বিক গবেষণা ও প্রয়োগমূলক গবেষণা একে অপরের উপর নির্ভরশীল ও পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। নারীশিক্ষা গবেষণায়ও এই ধরনের গবেষণার কথা বলা যেতে পারে। তাত্ত্বিক গবেষণায় নতুন তথ্য আহরণ ও তার ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন, ধরা যাক নারীশিক্ষার মন্থর অগ্রগতির কারণগুলি কি হতে পারে। প্রয়োগমূলক গবেষণার ব্যবহার হয়ে থাকে তখন যখন একজন গবেষক জানতে চান যে নারী ক্ষমতায়ণ কি ভাবে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে।

নারীশিক্ষায় গবেষণা পদ্ধতি আলোচনা করার আগে জানা দরকার শিক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতিগুলি কি কি। এই পদ্ধতিগুলি নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(Historical Research)

ইতিহাস শুধুমাত্র সময় এর হিসাবে বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ নয়। ইতিহাস বলতে বোঝানো হয় ব্যক্তি,

ঘটনা, সময় ও স্থানের পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা। ঐতিহাসিক গবেষণা বলতে বোঝান হয় যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অতীতের ঘটনার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। সাধারণত এক্ষেত্রে গবেষক পর্যবেক্ষণ ও অন্য ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রাথমিক উৎস যেমন জীবাশ্ম, হাড়, ধ্বংসাবশেষ অথবা বিভিন্ন বস্তুর থেকে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আবার সরকারি দলিল দস্তাবেজ, জীবনী, পত্রাবলি, বই, পত্রিকা ইত্যাদিও ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস হতে পারে।

ঐতিহাসিক গবেষণার যে অসুবিধাগুলো দেখা যায় তা হল গবেষকের নিজস্ব মতামত গবেষণার নৈর্ব্যক্তিকতা (objectivity) নষ্ট করতে পারে। প্রাথমিক উৎসের অভাব থাকতে পারে ও গবেষকের বিশ্লেষণ ধর্মী চিন্তার বা ব্যাখ্যা করার অক্ষমতা থাকতে পারে। নারীশিক্ষা গবেষণায় ঐতিহাসিক গবেষণার সাহায্য বিশেষভাবে নেওয়া হয় যা পরে আলোচিত হবে।

(Survey Research)

সার্ভে অর্থাৎ সমীক্ষা গবেষণার বৈশিষ্ট্য হল তথ্য অনুস্থান করা ও যে ঘটনাটির উপর গবেষণা করা হচ্ছে তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া। এই পদ্ধতির সাহায্যে কোন ঘটনা বা বিষয়ের ব্যাখ্যাও করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির সাহায্যে অনেক সময় দুটি বা তার বেশি দলের তুলনামূলক আলোচনা করা হয় আবার কখনও কখনও কোন ঘটনার কারণ ও প্রতিক্রিয়া (cause and effect) জানার চেষ্টা করাও হয়ে থাকে। সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে সার্ভে পদ্ধতির গুরুত্ব খুব বেশি এবং বহু মূল্যবান তথ্য বৈজ্ঞানিক সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে সংগ্রহ করা হয়। সাধারণ মানুষের মতামত, মনোভাব, আচরণ, আর্থসামাজিক অবস্থা জানা সম্ভব হয়।

(Experimental Research)

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন চলের (variable) প্রভাব ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করা হয়। কোন ঘটনা বা বিষয়কে একটি চল কিভাবে প্রভাবিত করে তা জানার জন্য অন্য চলগুলি নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং পরীক্ষামূলক চলটির প্রভাব কি ভাবে হচ্ছে তা জানা সম্ভব হয়। সমাজবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা কিছুটা অনিশ্চিত।

(Quasi Experimental Research)

সমাজবিজ্ঞানে অনেক রকমই পরীক্ষণমূলক গবেষণা করা বা সব ধরনের চলকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয় না বলে আপাত পরীক্ষণমূলক গবেষণা পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ ডিজাইন (Research Design) করে স্যাম্পেলের এককগুলিকে র‍্যান্ডাম পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন স্যাম্পল গ্রুপে ভাগ করা হয় এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়।

(Different Types of Research in Women's Education) :

নারীশিক্ষা গবেষণায় শিক্ষা বিজ্ঞানে যে সব গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় সেগুলিই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নারীশিক্ষা সম্বন্ধীয় গবেষণা একটি অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান পদ্ধতি। এ ব্যাপারে শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

(Historical Research and Women's Education)

মহিলাদের শিক্ষার প্রসার ও সমস্যার পিছনে যে যে কারণগুলিকে দায়ী করা যায় সেই সম্বন্ধে অনুধাবনের জন্য ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। নারী শিক্ষার বিকাশের প্রেক্ষাপট ও পটভূমি বিশেষ করে ব্রিটিশ শাসনে পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে কিভাবে নারীশিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে এই বিষয়ে গবেষণা বিশেষভাবে করা হয়েছে।

এই ধরনের গবেষণার জন্য যে সব উৎসের (Source material) সাহায্য নেওয়া হয় তা হল প্রাচীন পুস্তক, রিপোর্ট, দলিল, স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনী সরকারি ভাবে প্রকাশিত তথ্য ইত্যাদি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেনস্ স্টাডিজ কেন্দ্র এই ধরনের বেশ কিছু গবেষণা পরিচালনা করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন গবেষক ব্যক্তিগত ভাবে নারীশিক্ষার ঐতিহাসিক পশ্চাদপট ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করেছেন। যেমন একটি ঐতিহাসিক গবেষণার উল্লেখ করা যায় উদাহরণ হিসাবে Women in Nursing Profession : A Documentation Project. Women in pre independent India 1905-1947 (Gupta 2005).

(Survey Research and Women's Education)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই ধরনের গবেষণায় বৃহৎ এলাকার পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিষয় সম্বন্ধে বিশদ তথ্য নেওয়া হতে থাকে। মহিলাদের শিক্ষার ব্যাপারে এই ধরনের সার্ভে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। ভারতবর্ষের কোন কোন রাজ্যে নারীশিক্ষার হার কতখানি, এই শিক্ষার গড়, সাক্ষরতার হার, গ্রাম ও শহর এলাকার মধ্যে সাক্ষরতার হারের পার্থক্য ইত্যাদি গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যাপক নিরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যায়। সাধারণত কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক এই ধরনের তথ্য অনুসন্ধান করে থাকে। এই ধরনের ব্যাপক গবেষণা ব্যক্তিগত স্তরে করা কঠিন এবং প্রধানত বেসরকারি বা সরকারি সংস্থাগুলিই এই দায়িত্ব নিয়ে থাকে।

নারীশিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতি প্রণয়নের জন্য ব্যাপক নিরীক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যা কত, কতজন মহিলা বৃত্তিমূলক শিক্ষণ গ্রহণ করছে, মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কি রকম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সার্ভে পদ্ধতিতেই পাওয়া সম্ভব। সরকারি নীতি ও পরিকল্পনাগুলি কতখানি বাস্তবে প্রয়োগ হল এবং এর ফলে মহিলাদের অগ্রগতির বিষয়টিও এই ধরনের গবেষণার সাহায্যে পাওয়া যায়।

এই ধরনের একটি গবেষণার উল্লেখ করা যায়, যেটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স স্টাডিজ কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত। এটি হল Statistical Hand book of Gender based data system (Mukhopadhyay and Mukhopadhyay 2006).

(Experimental Research and Quasi Experimental Research and Women's Education)

আগেই বলা হয়েছে সমাজ বিজ্ঞানে পরীক্ষণমূলক গবেষণা পদ্ধতি সাধারণত দেখা যায় না। তবে আপাত পরীক্ষণ মূলক গবেষণা অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ ডিজাইনের সাহায্যে বিভিন্ন স্যাম্পল গ্রুপের তুলনামূলক বিচার এই পদ্ধতিতে করা হয়। মহিলা শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ধরনের পদ্ধতি (Quasi experimental

method) ব্যবহার যথেষ্ট প্রচলিত। যেমন একটি গবেষণা হল Educated women's attitude to gender equality and the role of married women in the family (Bose 2006 Women's Studies centre, Calcutta University)।

এই ধরনের গবেষণায় নারীশিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের (phenomenon) এর কারণ ও পরিণাম (cause and effect) বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন মেয়েদের শিক্ষার মন্থর প্রগতির সাথে যে সব প্রাসঙ্গিক চল (variables) এর সহগতি (Correlation) থাকে তা সনাক্ত করার প্রচেষ্টা করা যেতে পারে এই ধরনের গবেষণার সাহায্যে।

নারী ক্ষমতায়ণ, মহিলাদের পদমর্যাদা (Status of women) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে মহিলাদের পদ মর্যাদাবৃদ্ধি ইত্যাদি নারীশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর আপাত পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

(Quantative and Qualitative research and women's education)

পরিসংখ্যান এর সাহায্যে যে কোন গবেষণা পদ্ধতি থেকে তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়। মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণায় এই statistical পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন ঘটনার যেমন গাণিতিক বর্ণনা দেওয়া যায় আবার তেমনি নারীশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের সাহায্যে কোন কোন ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কি বিকাশ বা বৃদ্ধি হবে তাও অনুমান করা হয়ে থাকে (Inference)।

পরিমাণগত বা Quantative বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান-এর ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে (Inference) এ পৌঁছান যায়। পরিসংখ্যানের সাহায্যে অবশ্য কোন ঘটনার বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব। যেমন একটি গবেষণা কন্যা শিশু ভ্রূণ হত্যা (Female Foeticide in Kolkata, Mukherjee 2005 Women's Studies Centre) এক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের সাহায্যে এই ঘটনাটির সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গুণগত গবেষণায় অবশ্য সংখ্যাগত ব্যাখ্যার উপর জোর না দিয়ে গবেষণামূলক বিষয়ের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (Interpretative Research) করা হয়। এখানে গবেষণালব্ধ ফলের উপর অবশ্যই গবেষকের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার (Subjectivity) প্রভাব আসতে পারে এবং এই ধরনের গবেষণা পুনঃ পুনঃ করাও (replication) অনেক সময় সম্ভব হয় না।

মহিলা শিক্ষা গবেষণায় গুণগত গবেষণার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কারণ নারীশিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যা ও অন্যান্য ইস্যুগুলিকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে গবেষককে বিশেষ স্যাম্পল গ্রুপের সাথে প্রতিক্রিয়া করতে হয় (participant observation) এর ফলে নতুন তত্ত্ব অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় (ground theory) নারী ক্ষমতায়ণের বিষয়টি বিশদভাবে জানার জন্য এই ধরনের গবেষণা করা হয়ে থাকে। নারীশিক্ষা গবেষণায় বর্ণনামূলক (discriptive) ও বিশ্লেষণ ধর্মী (analytical) দুই ধরনের গবেষণারই প্রয়োজনীয়তা আছে।

(Summary) :

একমাত্র বৈজ্ঞানিক সম্মত গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতেই নারীশিক্ষা সংক্রান্ত নীতি সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা যায়। শিক্ষা বিজ্ঞানে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিগুলি সবসময়ই

নারীশিক্ষা গবেষণায় প্রয়োগ করা হয়েছে। সম্প্রতি নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য গবেষণার উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতসরকারের নির্দেশমত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উইমেন্স স্টাডি সেন্টার খোলা হয়েছে যার মূল উদ্দেশ্যই হল নারী প্রগতির জন্য গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি ব্যবহার করে শিক্ষার অগ্রগতি সুনিশ্চিত করা। যে সব পদ্ধতিগুলি এ প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয় তা হল ঐতিহাসিক গবেষণা, আপাত নিরীক্ষণ পদ্ধতি (Quasi Experiment) ও সার্ভে পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলির সাহায্যে নারীশিক্ষা সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। নারীশিক্ষা গবেষণায় কেস স্টাডি বা কোন এক ব্যক্তি বা কোন একটি দলকে বিশেষভাবে গভীর পর্যবেক্ষণ করে মূল্যবান তথ্য ও বিভিন্ন চলের কার্যকারণ সম্পর্ক জানা যাচ্ছে। এই ধরনের গবেষণায় আজকাল গুণগত গবেষণা বা Qualitative Research-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গুণগত গবেষণার সাহায্যে মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্যার ব্যাখ্যা করা সম্ভব ও ভবিষ্যতে কি ধরনের কর্মপন্থা নেওয়া উচিত হবে তাও জানা সম্ভভ হচ্ছে।

(Exercise) :

•

১। নারীশিক্ষা গবেষণার দুটি পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

২। নারীশিক্ষা গবেষণায় তথ্যের উৎসগুলি কি কি?

৩। গুণগত গবেষণার একটি ত্রুটি ও একটি সুবিধা উল্লেখ করুন।

৪। নারীশিক্ষা গবেষণার উন্নতির জন্য সরকারের একটি প্রচেষ্টা উল্লেখ করুন।

•

১। নারীশিক্ষা গবেষণায় অংশত পরীক্ষণ পদ্ধতির (Quasi experimental method) প্রয়োগ ব্যাখ্যা করুন।

২। নারীশিক্ষা গবেষণার দুটি পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখুন।

৩। পরিমাণগত (Quantitative) গবেষণার সাহায্যে নারী শিক্ষার কোন্ কোন্ দিকের উপর আলোকপাত করা সম্ভব?

৪। নারীশিক্ষা গবেষণার প্রয়োজনীয়তা কি?

•

১। নারী শিক্ষা গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করুন এবং কোন্ কোন্ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়?

২। নারী শিক্ষা গবেষণার প্রয়োগ সম্বন্ধে একটি রচনা লিখুন।